বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে যাহারা যুদ্ধের মাশুল হিসাবে তিলে তিলে আপনাদের নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, বাংলার সেই লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন-স্মৃতি বহিয়া এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করিল।

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার সহিত তাল রাখিয়া 'ভারত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে'র ন্যায় গ্রন্থ-রচনা সত্যই অত্যন্ত কঠিন। পুস্তকখানি ছাপা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের পরিবর্ত্তন যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তবুও যদি কোন অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়, সেজন্য আমার করিবার কিছুই নাই। আমেরিকার প্রতি এ গ্রন্থে যে সকল কটাক্ষ করা হইয়াছে, মিঃ ফিলিপ্‌সের যুক্তরাষ্ট্র-সভাপতির নিকট লিখিত পত্র প্রকাশিত হওয়ায় এবং সেনেটর চ্যাণ্ডলার প্রভৃতির আন্দোলনের পর তাহা অনেকের নিকট অবাঞ্ছিত বোধ হইতে পারে। যদিও এ পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না তবু এই পুস্তকে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা মূলতঃ পরিবর্ত্তন করিবার আমি কোন কারণ দেখি না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা যদিই বা চেষ্টা করে, ভারতের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে অর্থহীন হইবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বিগত মহামন্বন্তরের উপর প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া 'The Bengal Alienation of Agricultural Land (Temporary provisions) Ordinance, 1943 সম্বন্ধে আমি বিশেষ জোর দিই নাই, কারণ সত্যকার দুঃস্থদের ক্ষেত্রে এ আইন খুব বেশী কার্য্যকরী হইবে বলিয়া

আমি মনে করি না। গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও 'অধিকতর খাদ্য ফলাইবার' আন্দোলন যেমন সংবাদপত্রে আর শহরের বক্তৃতামঞ্চে ব্যর্থ হইয়া গেল, এই আইনের বার্ত্তাও তেমনি অধিকাংশক্ষেত্রে দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীকৃষকদের নিকট পৌছাইবে না, আর পৌছাইলেও সর্ব্বহারা এই দরিদ্রের দল এমন কোন আশ্রয় পাইবে না যাহা অবলম্বন করিয়া তাহারা আইনের সুবিধাগ্রহণের বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারে।

গ্রন্থখানিতে কতকগুলি ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। পাঠের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভুল সংশোধিত হইয়া গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হইল।

ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উৎসাহ না দিলে এ গ্রন্থ রচনা সম্ভব হইত না, এই সুযোগে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেছি। সুহৃদ্বর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র উৎসাহ করিয়া পুস্তকখানি ছাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর কলেজ
মহালয়া, ১৩৫১ সাল

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রাজশক্তির সাহায্যকল্পে ভারতবর্ষ হইতে বহু সৈন্য, প্রচুর অর্থ ও অগাধ পরিশ্রম জোগানো হইয়াছিল। সকলেই আশা করিয়াছিলেন, ভারতকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিয়া এই বিপুল পরিমাণ সাহায্যের জন্য সাধ্যমত প্রতিদান দিতে ব্রিটিশ সরকার কার্পণ্য করিবেন না। পরিবর্ত্তন কল্যাণ বহিয়া আনে,—ইহাই মানুষের সাধারণ ধারণা। যুদ্ধে অনেক ওলটপালট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে ভারতবাসীর স্বাধীনতা-লাভের স্বপ্ন শেষ পর্য্যন্ত স্বপ্নই থাকিয়া গেল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যুদ্ধবিরতির পর ভারতের জন্য মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু Progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire" ঘোষণাটি শেষ পর্য্যন্ত কতদিনে সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে ভারতবাসীদের আলোকিত করিবার জন্য তাঁহারা কোন আগ্রহই প্রকাশ করিলেন না। গতবারের মহাযুদ্ধে আমাদের দিক হইতে দানের কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু সে দানের মর্য্যাদা রক্ষিত না হওয়ায় সারা দেশের মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধজনিত হাজার ঝড়ঝাপ্টা সহিয়াও ভারত যদি সেইবার লক্ষণীয় শিল্পোন্নতি করিয়া খানিকটা স্বাবলম্বী হইতে পারিত তবু আমাদের সান্ত্বনার

আশা ছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির ঘূর্ণিতে পড়িয়া বহু সুযোগ পাইয়াও ভারতবর্ষের পক্ষে সেদিন নিজের পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয় নাই। সাম্রাজ্যভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা গতবারের যুদ্ধের সময় দেশের সকল সম্ভাব্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করিয়া লইয়াছিল। ভারতবর্ষ শুধু পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি বহিয়া সেদিন সুযোগের পর সুযোগ বৃথা যাইতে দিয়াছে।

তারপর অবস্থা যখন আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন সারাদেশব্যাপী ব্যর্থতার বেদনা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে। চাওয়া-পাওয়ার হিসাবে গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ এমনি অসহায় ভাবে বঞ্চিত হইয়াছিল যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কোন চিন্তা না করিয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ভারতবাসী সেদিন পরিষ্কার বুঝিয়াছিল, ব্রিটিশ শাসনের আমলে আধুনিক সভ্যতার সহিত তাহার যত পরিচয়ই হউক, বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা ইংরেজের কৃপাদৃষ্টিলাভে কোন কালেই সমাধান হইবে না। তাই এই সভ্যতার রাজপথের পাশে অস্পৃশ্যের মত বসিয়া থাকার চেয়ে তাহারা অসঙ্কোচে মরিয়া বাঁচিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বাস্তবিক ইংরেজ আসিবার আগে আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে এদেশ পিছনে পড়িয়া ছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানের মত দৈন্যের অনুশোচনা তাহার সেদিন ছিল না। ব্রিটিশ-শাসন দেড়-শতাধিক বৎসরে ভারতবর্ষে যাহা করিয়াছে, রাশিয়ার পঁচিশ বৎসরের সোভিয়েট-শাসনের কীর্ত্তি তাহার চেয়ে বহুগুণ বেশী। এতকাল পরে আজও ভারতবর্ষে পাঁচবৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক শতকরা মাত্র ১৪·৬ ভাগ লোক অক্ষর-পরিচয়ের স্পর্দ্ধা করিতে পারে; রাশিয়ার ১৯১৩ সালের শতকরা ২১ জন শিক্ষিত ব্যক্তির স্থলে ১৯৩৯

সালে শতকরা ৮৫ জন শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। জাপান যাহা কিছু করিয়াছে সমস্তই ইউরোপীয় জাতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া; কিন্তু দীর্ঘদিন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার নিকটতম সংশ্রবে থাকিয়াও আমরা উল্লেখযোগ্য কোন সম্পদের অধিকারী হইতে পারি নাই। ইংরেজ আমাদের সম্মুখে চোখ-ঝলসানো প্রাণপ্রাচুর্য্য লইয়া আসিয়াছিল, মোহগ্রস্ত আমরা তাহাদের প্রতি অহেতুক অনুরাগে আমাদের অনাড়ম্বর সচ্ছল জীবনের আনন্দটুকু হারাইয়াছি; অথচ দাতার যথোচিত ঔদার্য্যের অভাবে আমাদের জীবন নূতন পথের সন্ধান পায় নাই। ভারতের অস্বাস্থ্যের কথা সর্ব্বজনবিদিত; সুচিকিৎসার অভাবে যক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ সারানো এদেশে এখনো প্রায় অসাধ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ১৯১৭ হইতে ১৯৩৯—সোভিয়েট শাসনের মাত্র এই বাইশ বৎসরের কর্ম্মকুশলতায় রাশিয়ায় যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৮৩ ভাগ কমিয়াছে। আসল কথা, এদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনার সময় সরকারী দৃষ্টি বারবার সাতহাজার মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ভারতের ভাগ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিড়ম্বনাই শুধু জুটিয়াছে। এখন যুদ্ধ চলিতেছে, যুদ্ধের সময় ব্যয়বাহুল্য কমানোর অর্থ যুদ্ধে পরাজয়ের ঝুঁকি লওয়া, এখনকার খরচ সম্বন্ধে বলিবার আমাদের সত্যই কিছু নাই; কিন্তু সাধারণ সময়েও মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ দেশরক্ষা-খাতে খরচ করিবার কারণ কি? ভারতবর্ষ মধ্য-ইউরোপের দেশ নয়, মন্দিরে আর মসজিদে মাথা ঠুকিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারিলেই ভারতবাসী মোক্ষলাভ করিয়া থাকে; তাহাদের দমনের জন্ম কামান দাগিবার আবশ্যকতা কোথায়? সামরিক বিভাগের হাতীর খরচ জোগাইতে তাই ভারতের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-খাতে টাকা কম পড়িয়া যায়।

১৯৩৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমেরিকায় মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ছিল বৎসরে ৫৫ টাকা, ব্রিটেনে ১৯ টাকা, ভারতবর্ষে অনেক আন্দোলন ও তদ্বিরের পর ইহার পরিমাণ মাত্র আট আনার কাছাকাছিতে পৌছিয়াছিল! সমগ্র জাতি যেখানে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রহিয়াছে সেখানে শিক্ষার জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষার অধিকারী নই বলিয়া এই অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

এমনি করিয়া বহু না-পাওয়ার ব্যর্থতা ও ক্ষতির অনুশোচনায় নিজেদের যোগ্যতা বাড়াইবার প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে ও কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস জাতিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার যে শুভ সঙ্কল্প গ্রহণ করে, তাহারই সার্থক প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন ইতিহাস রচনা শুরু হইয়াছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই কল্যাণী সঙ্কল্প রূপায়িত করিবার যে প্রয়াস তাহারই ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে অগ্রগতি, সমাজ-জীবনের সংস্কার-সাধন, ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠনের সাধনা। ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড ঘোষণা হইতে শুরু করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের সংস্কার পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের দিক হইতে দানের মহিমা বাড়াইবার যত চেষ্টা হইয়াছে, সমস্ত বাহ্যাড়ম্বরের অন্তঃস্থলে প্রচণ্ড স্বার্থপরতা ও দীর্ঘসূত্রতা অনুভব করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অধিকতর সজাগ হইয় উঠিয়াছি। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে * সাপ্রু, জয়াকর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি নরমপন্থী রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতকে

*১২ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সাল।

স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কংগ্রেস তখন এখানে সংগ্রামরত, এই সব উদারপন্থীকে হাত করা সেদিন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। তবু যে ক্ষমতাগুলি ব্রিটিশ সরকার হাতে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদের অভাবে স্বায়ত্তশাসন মিথ্যা বলিয়া জয়াকর সাপ্রুর মত উদারনৈতিক নেতাদেরও নিঃসন্দেহ ধারণা জন্মিল এবং তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। বাস্তবিক ভারতীয় সৈন্যদের উপর যদি ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রণ পূর্ণভাবে চলিতে থাকে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা যদি ভারতবাসীরা পরিচালনা করিবার সুযোগ না পায় এবং ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্যনীতি স্থির করিয়া দিবার সর্ব্বময় অধিকারী যদি ইংরেজই থাকে,—অন্তঃসারশূন্য স্বায়ত্তশাসন লইয়া তাহা হইলে ভারতবর্ষের সত্যকার লাভ হইবে কি?

ভারত নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সাধনায় নানা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অতি ধীর গতিতে সাফল্যলাভ করিতেছিল। আত্মচেতনার গৌরবে জাতীয় জীবন যখন সারা দেশের ব্যক্তিজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছিল, তখনই গত যুদ্ধের কলঙ্ক আবার ইউরোপে নূতন যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মানী যুদ্ধে নামে, ১৯৪০ সালের জুন মাসের মধ্যে দুর্ভেদ্য ম্যাগিনট লাইনের আড়ালে থাকিয়াও ফ্রান্স জার্ম্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। জার্ম্মানী বিদ্যুৎ-গতিতে ইউরোপের নিম্নভূমির দেশগুলি, বল্কান রাষ্ট্রসমূহ এবং আফ্রিকা ও রাশিয়ার অনেকখানি অধিকার করিয়া লইল এবং তাহার মিত্রশক্তি হিসাবে ১৯৪১ সালের শেষ দিকে জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় ইংলণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে ব্রিটিশ, আমেরিকান

ও ভারতীয় সৈন্যদের বাধার সম্মুখীন হইয়াও জাপান হংকং, সিঙ্গাপুর, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া লইয়াছে এবং ভারত-সীমান্তে তাহাদের আবির্ভাব কেবল মাত্র আমাদের রাজনৈতিক জীবন নয়, আমাদের আর্থিক জীবনেও তুমুল আলোড়ন তুলিয়াছে।

জাপান যুদ্ধে নামিবার বহু পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষ এ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। অবশ্য এই যোগদান যে ভারতীয় জনসাধারণের সম্মতি লইয়া হইয়াছিল তাহা নয়, তবু মিত্রপক্ষের খাতায় যুধ্যমান দেশ হিসাবে নাম লিখাইবার ফলে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক অসুবিধাগুলিও তাহাকে ভোগ করিতে হইতেছে। কাহারও কাহারও মতে ভারত এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিত; আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়া অনেকে বলেন যে, ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থভুক্ত হইয়াও আয়র্ল্যাণ্ড দীর্ঘ চার বৎসরের অধিককাল নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলে ভারতবর্ষের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা একেবারে অসম্ভব ছিল না। অবস্থা-বৈগুণ্যে অবশ্য এ সকল নীতির কথা ভারতের বেলায় খাটে না। ভারত-সীমান্ত বিপন্ন না হইলে ভারত যুদ্ধ করিবে না বলিয়া ভারতশাসন-আইনে যে ধারাটি বর্ত্তমান ছিল এবং যাহার অপব্যবহার করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তীব্র সমালোচনা সহ্য করিয়াছিলেন, ১৯৩৫ সালে ঐ আইন সংস্কারের সময় সেই ধারাটি তুলিয়া দিয়া বড়লাটকে ভারতশাসন ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। এখন আমাদের দেশের কাহারও পক্ষে বা বিপক্ষে যোগ দেওয়া জনগণের বিবেচনা অপেক্ষা বড়লাটের ইচ্ছার উপর অধিকতর নির্ভর করে। যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি তিনি, সেই যুধ্যমান পার্লামেণ্টকে সাহায্য না করিয়া ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও বড়লাট চুপ করিয়া থাকিবেন ইহা অবশ্যই কেহ আশা করে না। আমাদের বিচিত্র রাজ-

নৈতিক পরিস্থিতিতে আমেরিকা কি করিয়া যুদ্ধের প্রথম সাতাশ মাস বাণিজ্য চালাইয়াছিল, আয়র্ল্যাণ্ড ও স্পেন কেমন করিয়া আজও বন্ধুদের দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, মুসোলিনীর ইটালি কোন্ যুক্তিতে ৯ মাস নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছিল,—এ সকল প্রশ্ন অবান্তর। যুদ্ধে যোগ দিবার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে ভারতবাসী হয়তো সরল অপ্রস্তুত চীনের উপর জাপানী বর্ব্বরতা স্মরণ করিয়া এবং হিটলারের বিনাদোষে মধ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ সমর্থন না করিয়া মিত্রপক্ষের হইয়াই যুদ্ধ ঘোষণা করিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহাদের মতামত লইবার প্রয়োজন স্বীকৃত হইল না বলিয়া আদর্শের বড়কথা তাহার মুখে মানায় না।

আজ অতীতকে যথেষ্ট পিছনে ফেলিয়া আসিয়া একথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, ভারতবর্ষ সত্যই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের মত ভারতের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। চিরকাল কৃষিকেন্দ্রিক থাকিয়া এদেশ শিল্পোন্নতি করিতে পারে নাই, তাছাড়া সরকারী ঔদাসীন্যও ভারতের আর্থিক বনিয়াদের শিথিলতার জন্য আংশিক দায়ী। বর্ত্তমান মহাসমরে সমুদ্রপথ বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে, নিতান্ত নগণ্য পণ্যের জন্যও যে দেশকে বাহিরের আমদানীর অপেক্ষা করিতে হয়, তাহার দুর্দ্দশা এই যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় সহজে অনুমেয়। তাছাড়া পাট, তুলা প্রভৃতি কৃষিপণ্য রপ্তানী করিয়াও ভারতের যে অর্থাগম হইত তাহা উপস্থিত নৌযুদ্ধের প্রভাবে ও জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ শত্রুপক্ষ বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সবার উপরে বিদেশ হইতে শতকরা যে আড়াই ভাগ খাদ্য আসিয়া ভারতের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত,ব্রহ্ম হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি

দেশ হইতে মাল আমদানী অসম্ভব হইয়া উঠায় তাহা এখন আর পাওয়া যাইতেছে না। এই ভাবে বর্ত্তমান মহাসমর, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য আহত করিয়া তাহাকে অত্যন্ত দুরবস্থায় ফেলিয়াছে। আমাদের অভাব ও অসচ্ছলতা সম্বন্ধে যাঁহারা প্রথম হইতে অবহিত ছিলেন, তাঁহাদের যুক্তি সরকার পক্ষ হইতে এই বলিয়া খণ্ডন করা হইল যে, বেসরকারী পণ্য বৃদ্ধির নামে সারা দেশে যদি নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সমরোপ-করণ উৎপাদনের প্রয়াস বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইবে এবং ফলে শত্রুর আক্রমণে বাধা প্রদানে অসুবিধা ঘটিবে। নিতান্ত অপ্রস্তুত ছিলেন বলিয়া এবং অবস্থার গুরুত্বে অত্যধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধের প্রথমদিকে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে একথা বলা সম্ভব হইয়াছিল। কথাগুলি সত্যই এমনি অন্ধকার ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া বলা হইয়াছিল যে সেদিন ইহার স্বচ্ছন্দ প্রতিবাদ জানাইবার ভরসা পাওয়া যায় নাই। আজ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া এ সন্দেহ যদি মনে জাগে যে সেদিনকার শিল্পপ্রসারের আগ্রহ অঙ্কুরে বিনাশ করিবার ব্যবস্থার পশ্চাতে নিশ্চয় কোন সরকারী উদ্দেশ্য লুকাইয়া ছিল, তাহা হইলে বোধ হয় খুব অন্যায় হইবে না। ভারত-সরকার ভারতের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সত্য সত্যই সোনার চক্ষে দেখেন না। আমাদের দেশে অনেকগুলি সমরোপরণ প্রস্তুতের কারখানা আজও চালু রহিয়াছে, বহুলোক সেই সব কারখানায় কাজও করে, তবু দেশে বেকারের সংখ্যা গনিয়া শেষ করা যায় না। ভারতের মধ্যে যে বাংলাদেশ যুদ্ধপ্রসঙ্গে সবচেয়ে অধিক দৃষ্টি-আকর্ষণ করে, তাহারই বুকে উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ছাড়াও তীব্র দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া গেল। এই দুর্ভিক্ষে অন্নসংস্থানের কোন

সুযোগ না পাইয়া প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে অনাহারে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। * কাজ করিবার যোগ্যতা তাহাদের একদিন অবশ্যই ছিল, কিন্তু কাজ জুটাইতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা অনাহারে তিলে তিলে মরণযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। পূর্ব্ব এশিয়ার মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া হইতে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বগ্রাসী এই সমরে কতলোক সত্যই মরিয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু প্রচারোদ্দেশ্যে নিহতদের সংখ্যা বাদ দিলে সুদীর্ঘ তিন বৎসরে উভয় পক্ষে নিহত সৈন্যের সমষ্টি বাংলার দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যার চেয়ে যথেষ্ট বেশী কিনা, সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৪ সালের সমাবর্ত্তন উৎসবে বাংলার এই শোচনীয় পরিস্থিতিকে কু-শাসনের চরম পরিচয় বলিয়া অভিহিত করেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নিরন্ন পথচারীদের বাঁচাইবার সুযোগ ছিল সত্য, কিন্তু সময় থাকিতে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় নাই বলিয়া অন্তিমকালে হাজার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু হইল না। পূর্ব্ব হইতে যদি এদেশে শিল্পাদির প্রসার হইত, বহু মৃত্যুমুখী দেশবাসী সেই সব শিল্পাগারে পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অন্নসংস্থান করিতে পারিত। ক্যানাডা যুদ্ধে ব্রিটেনকে পণ্য জোগাইয়া ২৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ পাইয়াছিল এবং সেই স্বর্ণের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র হইতে নানা যন্ত্রপাতি আনিয়া ক্যানাডা যথেষ্ট শিল্পপ্রসার করিয়া লইয়াছে। ভারতের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পণ্যাদি গ্রহণ করিয়া ব্রিটেন যদি অকেজো ষ্টার্লিং বণ্ড না দিয়া স্বর্ণ দিবার ব্যবস্থা করিত এবং সহানুভূতির সহিত তাহার শিল্প-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত, তাহা

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের রিপোর্ট

হইলে ভারতেও এই যুদ্ধের আমলে বহু পরিমাণ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব ছিল। সাত সমুদ্র পারের নিজেদের শিল্পজীবী দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভারতের শাসকসম্প্রদায় এদেশের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া গেলেন, ফলে যুদ্ধের দুর্লভ সময় পাইয়াও ভারতবর্ষের পক্ষে পুরাতন শিল্পের প্রসার বা নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা মোটেই আশানুরূপ হইল না। যদিও চরম অনটনের চাপে ভারতে কিছু কিছু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহারা কতখানি সরকারী সহানুভূতি লাভ করিবে, সে সম্বন্ধে এখন হইতেই জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার বিবিধ শিল্পের কথাই ধরা যাক। ইউরোপের যুদ্ধের চাপে ভূমধ্যসাগরের পথ যতদিন বিঘ্নসঙ্কুল ছিল এবং ইংলণ্ড হইতে ভারতে পণ্য প্রেরণ বন্ধ ছিল, সেই সুযোগে ভারতীয় পাটকল সমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য ববিন-শিল্প বাংলায় গড়িয়া উঠে। ভূমধ্যসাগরের পথ মুক্ত হওয়ায় আবার ব্রিটিশ ববিন ভারতে চালান আসিতেছে দেখিয়া ভারত সরকার ববিনের দর এত কমাইয়া দিয়াছেন যে বাংলার ব্যবসায়ীগণ সেই মূল্যে ববিন বিক্রয় করিলে তাঁহাদের লাভ থাকিবে না বলিলেই চলে। তাছাড়া ডিফেন্স রুল অনুযায়ী ভারত সরকার ববিন বিক্রেতাদের বিনা লাইসেন্সে কাজ করিতে দিতে অসম্মত হইয়াছেন। এদিকে ববিন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাঁহারা নাকি দরখাস্ত করিয়াও লাইসেন্স পাইতেছেন না। সংঘবদ্ধ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করা এমনিই দরিদ্র ভারতীয় শিল্পের পক্ষে কঠিন, তাহার উপর যদি ভারত সরকার সাহায্য করার পরিবর্ত্তে এইভাবে নবগঠিত শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ব্যবস্থা করেন, ভারতবর্ষের শিল্প-জাগরণ কিছুতেই সম্ভব হইবে না। ১৯৪০—৪১ সালের রিপোর্টে ভারত সরকারের রেলওয়ে মেম্বার ভারতে ইঞ্জিন

নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা দিয়াছিলেন, এতকাল পরে অনেক তদ্বিরের পর টাটা কোম্পানী ভারতসরকারের নিকট হইতে রেল ইঞ্জিনের কারখানা খুলিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা খোলা হইলেও রেল সমূহের মালিক ভারত সরকার যদি নিয়মিত দেশী মাল গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো এই কারখানা প্রতিষ্ঠার কোন মূল্য থাকিবে না। ভারতে মোটর গাড়ী তৈয়ারীর কারখানা খুলিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু ভারত সরকারের দিক হইতে আগ্রহ প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া কোন চেষ্টাই সার্থক হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে ভারতকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখার অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও বিড়লাকে এদেশে দুইটি মোটর গাড়ী তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। মোট কথা, দেশীয় শিল্পের সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া দিয়া ভারতসরকার ভারতের উন্নতি যদি সত্যসত্যই কামনা করিতেন, তাহা হইলে অন্যদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও আর্থিক সাহায্য ও উপদেশ দানে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপদান-গুলি এদেশে নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা এতদিনে তাঁহারা অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিতেন।

ইউরোপের মহাযুদ্ধ ১৯৩৯ সালে শুরু হইলেও, একমাত্র শেয়ার বাজারে প্রতিক্রিয়া ও ইউরোপের দেশগুলি হইতে মাল আমদানী কমিয়া যাওয়া ছাড়া ভারতবর্ষে তাহার প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় নাই; বরং গতবারের যুদ্ধে বিদেশের বিভ্রাটের সুযোগ লইয়া যাহারা পাট প্রভৃতির ব্যবসায়ে ও চালানী কারবারে লক্ষপতি হইয়াছিলেন, এবারের যুদ্ধেও তাঁহারা এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণকারীরা বেশ কিছু

গুছাইয়া লইবার আশা মনে মনে পোষণ করিতেন। একদিকে ভারতসরকার যখন ইউরোপের পথে সৈন্য পাঠাইয়া কর্ত্তব্য-পালনের গৌরব অনুভব করিতেছিলেন, অন্যদিকে জনসাধারণ সংবাদ-পত্রের যুদ্ধের দৌলতে নিজেদের লাভক্ষতির মাপকাঠিতে যুদ্ধের গতি মাপিয়া চলিতেছিলেন। ভারতের অনাগত দুর্দ্দিনের কথা সেদিন কাহারও মনে হয় নাই এবং সে সময় অপ্রস্তুতির জন্য কেহই মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

তাহার পর হঠাৎ ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্ব এশিয়ায় রণদামামা বাজিয়া উঠিল। অ-প্রস্তুত চীনের সহিত পাঁচ বৎসর যুদ্ধ করিয়াও যে জাপান তাহাকে কাবু করিতে পারে নাই, আকস্মিক আক্রমণের ক্ষিপ্রতায় ইংরেজ, ওলন্দাজ ও আমেরিকার সুদূর প্রাচ্যের বিরাট ভূসম্পত্তি তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই দখল করিয়া লইল। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সিঙ্গাপুরে 'পঞ্চম জর্জ্জ ডক' তৈয়ারী করা হইয়াছিল, জাপানের অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই নৌ-ঘাঁটির পতন হইল, ইংরেজদের বিশাল যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' সলিল-সমাধি লাভ করিল এবং একমাত্র পার্লহারবারে আমেরিকার যে বিরাট ক্ষতি হইল তাহার হিসাব দেওয়া যায় না। এমনি করিয়া ঝড়ের মত অগ্রসর হইতে হইতে জাপান যখন ব্রহ্মজয়ের পালা সাঙ্গ করিয়া আনিল, তখন ভারতবাসী ও ভারতসরকারের চেতনা ফিরিয়া আসে এবং প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদ আসায় আমরা নিষ্করুণ ভাবে বুঝিতে পারি যে, গতযুদ্ধ আর এই যুদ্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। তৈয়ারী না থাকার কলঙ্ক ঢাকিতে ভারতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল এবং যখন ব্রহ্মসরকার অসীম দায়িত্ব ও অসংখ্য প্রজা সঙ্গে লইয়া ভারত সরকারের আতিথ্য

গ্রহণ করিলেন, ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্য পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানকে তাড়াইবার প্রয়োজন তখন ভারত সরকার উপলব্ধি করিলেন সম্যক্‌ভাবে। এই আকস্মিক চেতনা লাভের ফলে সর্ব্ববিষয়ে সঙ্কোচ ঘটিয়া ভারতে সমরায়োজনে অজস্রতা সৃষ্টির চেষ্টা পুরোদমে চলিতে লাগিল। একে ইউরোপের যুদ্ধের জন্যই পরমুখাপেক্ষী আমরা নানা প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলাম, এখন জাপান যুদ্ধে নামিলে ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে মাল চলাচলও প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। বরাবরই জার্ম্মানী ও জাপানের সহিত আমাদের অনেক টাকার কারবার চলিত, সুস্থ অবস্থায় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা কোন ব্যবস্থাই করি নাই, এখন শুধু জাপান ও জার্ম্মানীর সহিতই আমাদের বাণিজ্য বন্ধ হইল না, তাহাদের ও তাহাদের সহযোগীদের উৎপাতে কোন দেশের পণ্যের পক্ষেই স্বাভাবিকভাবে ভারতে আসা সম্ভব রহিল না। সরবরাহের অভাবে দেখিতে দেখিতে এ দেশে সমস্ত জিনিসের দাম বহুগুণ বাড়িয়া তো গেলই, ইহার উপর অনির্দ্দিষ্ট আবহাওয়ার সুবিধা লইয়া এখানকার ব্যবসায়ীরা 'কালা বাজারে'র আশ্রয় গ্রহণ করায় প্রকাশ্য বাজার হইতেও জিনিসপত্র প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। জার্ম্মানীর নিকট হইতে আমরা রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র, চামড়া পাকা করিবার সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি বাবদ প্রায় ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিতাম। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করিয়া জার্ম্মানীতে প্রস্তুত ডাক্তারী জিনিসপত্রের অভাব আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠে। জার্ম্মানীর তৈয়ারী ঔষধাদির উপরেই মানুষের প্রাণরক্ষার আগ্রহের সুবিধা লইয়া সবচেয়ে অধিক পরিমাণ চোরাবাজারের জুলুমবাজী চলিয়াছে। জাপান ও

জার্ম্মানী ভারতের আমদানী বাণিজ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান এবং রপ্তানী বাণিজ্যে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিত। এই দুই দেশের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় ব্যাবসায়িক ক্ষতি ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আমাদিগকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। ভারত-সরকার মোটামুটি সকল দ্রব্যের দর বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু খুচরা বিক্রেতাদের হাতে মাল ঠিকমত সরবরাহ করা হইতেছিল না বলিয়া এবং বড় ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে অধিক লাভ পাইবার আশায় মাল ধরিয়া রাখায়, চোরাবাজারে যে মাল বিক্রীত হইতে লাগিল তাহার দর বিক্রেতাদের খেয়াল ও ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া জনসাধারণের প্রভূত অসুবিধা সৃষ্টি করিল। একে সরকারী প্রয়োজন সামান্য আমদানী হইতে বরাবরই আগে মিটানো হইয়া থাকে, তাহার উপর আবার ব্যবসায়ীদের কুচক্রে স্বভাবত-দরিদ্র এই দেশে পণ্যাদির অনটনে হাহাকার পড়িয়া গেল। ভারতবর্ষে যুদ্ধের আমলে কিছু কিছু নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু সরকারী প্রয়োজন সেই সব শিল্পের উৎপাদন এমনভাবে গ্রাস করিতেছে যে তাহাদের উৎপাদিত বস্তু জনসাধারণের চক্ষের সম্মুখে আসিতে পারিতেছে না। ভবিষ্যতে একদিন যখন যুদ্ধ থামিবে এবং আবার পূর্ণোদ্যমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা যখন শুরু হইবে, সরকারী প্রয়োজন মিটাইয়া আজ যে সব শিল্পপতি লাভের মোহে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন, সেদিন বাজারে পরিচিতির অভাবে তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসা চালান হয়তো সম্ভব হইবে না।

এইভাবে সরকারী প্রয়োজন মিটাইবার যথেষ্ট সুযোগ থাকাতে দেশী বিদেশী অধিকাংশই পণ্যই দুঃস্থ জনসাধারণের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্য ঘটায় ব্যবসায়ী

মহল যেমন আমাদের অসহায়তার সুযোগ লইয়াছেন, তেমনি ভারত-সরকারের দিক হইতে দর বাঁধিয়া দেওয়ার সহিত যথেষ্ট মাল জোগাইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই বলিয়া বাজারের অবস্থা অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। যানবাহন বা মালগাড়ীর সংখ্যা সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে মারাত্মকভাবে কম পড়ায় শুধু বিদেশী ও এ দেশের শিল্পপণ্য নয়, খাদ্যদ্রব্যাদিও সকল প্রদেশে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি অনুসারে বণ্টন করা সম্ভব হয় নাই। ভারতসরকার ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর হইতে ১৯৪২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পরপর ছয়টি মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সভার আহ্বান করিয়াছিলেন, সম্মেলনগুলিতে অনেক প্রয়োজনীয় প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল,কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের লজ্জাকর অকর্ম্মণ্য-তায় ও মালগাড়ীর অভাবে প্রস্তাবগুলি শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে সমূহে ৬,৬১,০০০টি মালগাড়ী বেসরকারী পণ্য বহনের জন্য পাওয়া গিয়াছিল, এই সংখ্যা মাত্র ১৫ মাসের মধ্যে ১৯৪২ সালের জুন মাসে ৫,১৪,০০০-এ নামিয়া আসে। ১৯৪২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ সম্মেলনে ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব সোজা ভাষায় মন্তব্য করেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্য সরবরাহ ও বণ্টনের উপর কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ-নীতি চালাইতে না পারিবেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদারদের মারফৎ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ মাল বাজারে ছাড়িতে না পারিবেন—ততদিন বৃহৎ আকারের বাজারে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের নীতি কার্য্যকরী করিয়া তোলা খুবই কঠিন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। * এই পণ্য জোগান ও মূল্য

* "It is clear that so long as the Controlling authority does not control the supply of Commodities and their distribution

নিয়ন্ত্রণের সমতা রক্ষা করা হয় নাই বলিয়াই ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে যথেষ্ট খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। বার্ম্মা জাপানীরা দখল করায় প্রায় ৩০ কোটি টাকা মূল্যের ২০ লক্ষ টন চাউল হইতে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত হইতে হয়, অষ্ট্রেলিয়ার পথ বিপদসঙ্কুল হওয়ায় সেখান হইতে মাল আসা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে, ক্যানাডা হইতে মাল আনাইবার ব্যয় অনেক, ক্যানাডার দূরত্বও যথেষ্ট, এবং খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন অধিকদিন অপেক্ষা সহিতে পারে না ; এমনি নানা কারণে স্বাভাবিক ঘাটতি দেশ ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব তীব্র হইয়া উঠে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ভারতের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য হইতে ভারত সরকার ইরাক, ইরাণ ও মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ২,৫৭,৭৯২ টন চাউল ও ২১,২৯৪ টন আটা রপ্তানী করিবার অনুমতি দিলেন। ভারতবর্ষের সৈন্য ঐ সকল স্থানে মিত্রপক্ষের হইয়া যুদ্ধ করিতেছে ইহাই যদি চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য রপ্তানীর যুক্তি হয়, সেই হিসাবে ব্রহ্ম-প্রত্যাগত যে অসংখ্য আশ্রয়প্রার্থী এদেশে আসিয়াছে, অথবা ভারতরক্ষার নামে আমেরিকান, ক্যানাডিয়ান, ব্রিটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান যে সব সৈন্য এখানে আসিয়া জমা হইয়াছে এবং বন্দীনিবাসগুলিতে বিদেশী যে সব বন্দী রহিয়াছে,—তাহাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের নয়। ভারতের প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের এইগুলিও

and it is not in a position to sell in the market large quantities through recognised trade agencies at the controlled rates, the legal maximum cannot be made effective over a large range of the market. Control over supplies and distribution are therefore essential and vital corrolaries to effective price control.

কারণ বিশেষ এবং ব্রিটিশ সরকার যদি বাহির হইতে লোক আনার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে খাদ্য আনিয়া বিপন্ন ও দরিদ্র ভারতবর্ষকে দায়িত্বপালন হইতে রেহাই দিতেন, তাহা হইলে ভারতের সমস্যা এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারিত কি না সন্দেহ। তাছাড়া এদেশের উপস্থিত অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্যও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। ভারত-সরকার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কর বসাইয়া আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্দ্ধিত করের সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ীরা পণ্যমূল্য যথেষ্ট বাড়াইয়া দিলেও গভর্ণমেণ্ট মূল্য-নিয়ন্ত্রণ না করিলে জনসাধারণের কিছুই বলিবার থাকিতেছে না। ইহার উপর জনকতক ভাগ্যবান লোক সামরিক জোগান প্রভৃতি দ্বারা দুহাতে পয়সা উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অনিশ্চিত সময়ে স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে থাকায় বাজারের সামান্য পরিমাণ পণ্য অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে। এমনি করিয়া বিত্তশালী ব্যক্তিদের দৌরাত্ম্য, সামরিক প্রয়োজন, বন্দীনিবাস, পণ্যের অনটন, সরকারী অব্যবস্থা, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধজনিত যানবাহনের অসুবিধা, এবং সবার উপরে ব্যবসাদারদের কালাবাজারের আশ্রয় গ্রহণ, —এই সব উপসর্গের জন্য ভারতের দরিদ্র জনমণ্ডলীর ক্লেশের আর শেষ নাই। নিউজিল্যাণ্ডের সহিত ভারতের এদিক হইতে তুলনা করিলে আমরা ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ—দুইদেশই ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত। উভয়েই যুধ্যমান জাতি হিসাবে যুদ্ধের অসুবিধা সমূহের সম্মুখীন হইয়াছে। তবু নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ পিটার ফ্রেজারের অধীনে মন্ত্রীসভা এই বিপজ্জনক অবস্থায়ও এমন সুশৃঙ্খলার সহিত শাসনব্যবস্থা চালাইতেছেন যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিউজিল্যাণ্ডে এখনও

প্রায় আগেকার মতই রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 'নিউজিল্যাণ্ড ওয়ার নিউজ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, পাঁউরুটি, আটা, মাখন, পনীর, দুধ, চিনি, ওটমীল এবং মাংস যুদ্ধের পূর্ব্বে যে দরে বিক্রীত হইত এখনও সেই দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অথচ ভারতবর্ষে গত বৎসরের কথা বাদ দিলেও প্রায় স্বাভাবিক বর্ত্তমান বৎসরের যে মাসেও প্রধান খাদ্য দ্রব্যাদির সূচক সংখ্যা সরকারী হিসাবেই ২৩১৪।*

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে প্রায় ৭০,০০০ সৈন্য প্রতিমাসে সাম্রাজ্যের পক্ষে যোগ দিয়াছে; নেপালী, পাঞ্জাবী, জাঠ, পাঠান প্রভৃতি জাতির সেনারা প্রভূত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ইয়োরোপ, এ্যাফ্রিকা ও ব্রহ্মরণাঙ্গনে। সামরিক ব্যয়ের দিক হইতেও ভারতবর্ষ প্রথম পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা খরচ করিয়াছে। এই বিপুল-পরিমাণ সাহায্য করিবার পর এবং নিজেরা এত অসুবিধা সহিবার পর মিত্রপক্ষের জয় হইলে আমাদের কি লাভ হইবে তাহা জানিতে ইচ্ছা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। আজ ভারতবাসী মাত্রেই জানে যে, ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার বহু উর্দ্ধে জাতীয় স্বার্থের স্থান। এখন দু' একজনকে সম্পত্তি, পদক বা উপাধি পুরস্কার দিলেই ভারতবাসী দীর্ঘদিনের রণশ্রম ভুলিতে পারিবে না। জার্ম্মান ও জাপানীদের হাতে কত ভারতীয় সৈন্য মরিয়াছে বা বন্দী হইয়াছে জানি না, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অবশ্যই নগণ্য নয়। যুদ্ধে যদি ভারতবর্ষ জড়াইয়া না পড়িত, তাহা হইলে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে যে অসংখ্য নরনারী দিনের পর দিন অনাহারে জীবন দিয়াছে, নানা কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদের অনেককেই মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইত। গতবারের

* ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে এই সংখ্যা ১০০ হিসাবে ধরা হইয়াছে।

যুদ্ধের নৈরাশ্য সত্ত্বেও এখনও আমরা ব্রিটিশ জাতির ঔদার্য্যে ভরসা রাখি। ডবি, কোভ, সিনওয়েল, সোরেনসেন ও অন্যান্য শ্রমিক সভ্যগণ আমাদের দুঃখের কথা যেরূপ সহানুভূতির সহিত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ। এখনও এদেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ভারতশাসন-আইনের প্রতিটি সংস্কার progressive realisation of responsibility বলিয়া বিশ্বাস করেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের চাপে বিব্রত হইয়াও নিজেদের অনুপযুক্ততা দুর্গতির কারণ মনে করার মত লোকের সংখ্যা এখনও এদেশে কম নয়। যুদ্ধজয়ের পর ভারতবাসীর এই বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা লইয়া ব্রিটিশসরকার আবার কি জুয়া খেলিবেন? স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া নিজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ রাজশক্তির বন্ধুত্ব-বিস্মৃতির বৃহৎ ইতিহাস আছে। যে মুসলিম লীগকে একদিন তাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া বড হইতে দিয়াছেন, আজ সৈন্য সংগ্রহের কেন্দ্রস্বরূপ পাঞ্জাবে মুসলীম লীগের দাবীতে ভেদসৃষ্টির সম্ভাবনা সহিতে না পারিয়া তাঁহারাই অন্যায় হস্তক্ষেপের দ্বারা লীগের সভ্য কাপ্টেন সৌকৎ হায়াৎ খানকে পদচ্যুত করিলেন। অথচ এই মুসলীম লীগকে সমর্থন করার পিছনে ভারতে ভেদসৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদের অধিকার কায়েমী করিবার অপচেষ্টার কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যে আগষ্ট আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্কের অভিযোগে নেতাদের আজও কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছে, তাহার কাল্পনিকতা সরোজিনী নাইডু ও লুই ফিশার প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই হাঙ্গামায় কংগ্রেসের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া মহাত্মা গান্ধী একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের মিথ্যা অভিযোগ তিনি এই ৭৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তিকায়

খণ্ডন করিয়াছেন। ভারত সরকারের অবিমৃষ্যকারিতায় জনসাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং তাহাই ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের আন্দোলনের জন্য দায়ী। কিন্তু এত প্রমাণ পরিচয়ের পরেও যাঁহাদের স্বার্থের সহিত কংগ্রেস নেতাদের বন্দিত্ব ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে, তাঁহারা এই সকল যুক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই এখনও যথেচ্ছাচার চালাইয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি মিঃ উইলিয়ম ডবি প্রমুখ এগারোজন শ্রমিক সদস্য গান্ধীজীর মুক্তির পর অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি কামনা করিয়া ভারত-সচিবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে ভারত-সচিব মিঃ আমেরি জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস আগষ্ট প্রস্তাব ফিরাইয়া না লওয়ায় রাজবন্দীদের মুক্তির কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বডলাট লর্ড ওয়াভেলও এই একই অজুহাতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পর্য্যন্ত অসম্মতি জানাইয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করিতে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতাদের যে আন্তরিক ইচ্ছা রহিয়াছে, ভারত-সরকারের অসীম ঔদাসীন্যে তাহা কিছুতেই ফলবতী হইতেছে না।

এই যুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই অল্পবিস্তর জড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রথম পাঁচবৎসরে শিল্পাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর কাজে ব্যস্ত ছিল। যে পরিমাণ অর্থ, সামর্থ্য ও কাঁচামাল এই যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া গেল তাহার হিসাব যেদিন প্রকাশ পাইবে, আজিকার উত্তেজনার শেষে অনিবার্য্য অবসাদের ক্ষুব্ধতায় সেই অঙ্ক যুধ্যমান জাতিসমূহকেও অনুতপ্ত করিয়া তুলিবে। অবশ্য যুদ্ধের পরম প্রয়োজনে কোন কোন দেশে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় স্বাবলম্বনের দিক হইতে সেই সব দেশ কিছু পরিমাণে লাভবান হইয়াছে বলা যায়। মালয়

হস্তচ্যুত হওয়ার পর আমেরিকা কৃত্রিম রবার উৎপাদন করিয়া রবারের তীব্র অভাব মিটাইতেছে। ভারতবর্ষে এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, ব্লিচিং পাউডার, সিগারেট, সিমেণ্ট, কাঁচ, লৌহ প্রভৃতি শিল্প যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রসারিত হইয়াছে। গতযুদ্ধে বৃটেনে এ্যালকোহলের অভাব অনুভূত হওয়ায় ইহুদি বৈজ্ঞানিক ডাঃ উইজম্যান কাঠ হইতে এ্যালকোহল প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এবারও ভারতের দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট ক্রিপটস্‌টেজিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা নামক ফুলের গাছ হইতে রবার উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সব আবিষ্কারের গৌরবে যুদ্ধের সময় একদিক হইতে বিজ্ঞান যেমন ধন্য হইয়া যাইতেছে, পৃথিবীর সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের এক বৃহৎ অংশ যে তেমনি বিজ্ঞানের অভিশাপে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার ফলে হয়তো এমন একদিন আসিবে যখন মানুষ যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াও কাঁচামালের অভাবে সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না।

একে পৃথিবীর শক্তিশালী যুধ্যমান দেশসমূহের অনেকেরই কাঁচামাল খুব কম এবং এইজন্যই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ উপনিবেশের দাবী করিয়া থাকে; তাহার উপর এই যুদ্ধে অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হওয়ায় যুদ্ধের পরে তাহাদের অধিকতর পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে। সেই দুঃসময় আজ প্রায় সমাগত বলিয়াই রজার্স মিশন, ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিল, এ্যাটল্যানটিক চার্টারের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য, পিছনে পড়িয়া থাকার জন্য যে সকল দেশে এখনও শিল্পোন্নতি হয় নাই, অথচ যেখানে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, সেই সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সমবণ্টনের ধুয়া ধরিয়া যদি পৃথিবীর অন্যত্র চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা

হইলে একদিকে যেমন তথাকার বিরাট বাজারে পরিণত শিল্পের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা সম্ভব হইবে অথবা সেই সব দেশের নূতন গড়িয়া ওঠা শিল্পকে কোনঠাসা করা যাইবে, সেইসঙ্গে প্রয়োজন মত কাঁচামালের জোগান পাইয়া শিল্পপ্রধান দেশ সমূহের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে না। যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় নিজেদের 'প্রভুর জাতি' মনে করিয়া আত্মগরিমায় মাটিতে পা দিতে লজ্জা বোধ করেন, ঠিক সেই কারণেই পীত চীন ও কালা ভারতবর্ষ বা আফ্রিকার বিরাট বাজার এবং বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্থায়ী আধিপত্য বিস্তারের অধিকার তাঁহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে চান। হয়তো এই জন্যই নানা অজুহাতে আমাদের বিদেশী সরকার ভারতকে স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ দিতে কার্পণ্য করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় প্রয়োজনমত শিল্পপ্রসার অসম্ভব করিতে এখানে নিয়ন্ত্রণের নামে কাঁচামাল আটকাইয়া ফেলা হইয়াছে, নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও পুরাতন শিল্পের প্রসার গভর্ণমেণ্টের অনুমতিসাপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বোনাস ও শিল্পে নিয়োজিত শ্রমজীবীদের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া দেশের আর্থিক সচ্ছলতা সৃষ্টির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করা হইয়াছে। অবশ্য পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পরিচালিত জাতীয় পরিকল্পনা সমিতিও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন শিল্পের প্রসার সরকারের অনুমতি-সাপেক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে জাতির অর্থ ও সাধনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবে যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া যাহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমগ্র দেশের কল্যাণ হইতে পারে, জাতীয় প্রয়োজনের পণ্য যাহাতে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত লাভালাভের উপর নির্ভর না করে

এবং বহুল উৎপাদনের জন্য বাজারের সম্ভ্রম নষ্ট না হয়, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গভর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। * বলা বাহুল্য এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত সরকার জাতীয় সরকার এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়াই তাহার গঠন। ভারতের বর্ত্তমান অর্থসচিব ঋণ করিয়া ও কর বসাইয়া-যুদ্ধের খরচ চালাইতে চান। অল্প অল্প করিয়া বর্দ্ধিত করভারও দেশবাসীর পক্ষে আজ অবহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আয় এভাবে যতই বাড়ুক, ব্যয়ের সহিত আয়ের সমতা রাখা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া ভারতসরকারের বাজেটে প্রতি বৎসরই ঘাটতি পড়িতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯৪'৬ কোটি টাকা, গত বৎসর সংশোধিত বাজেটে এই পরিমাণ ৯২'৪৩ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের যে বাজেট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের আলোচ্য বৎসরে আয় ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, সুতরাং এবারও ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা

The Committee is of opinion that no new factory should be allowed to be established, and no existing factory should be allowed to be expanded, or to change control, without previous permission in writing of the Provincial Government. In granting such permission the Provincial Government should take into consideration such factors as desirability of location of industries in a well-distributed manner over the entire Province, prevention of monopolies, discouragement of the establishment of uneconomic units, avoidance of over-production, and general economic interest of the Province and the country. The various Provincial Governments should secure for themselves requisite powers for the purpose, if necessary, by undertaking suitable legislation.

Note for the guidance of Sub-Committees, Hand-Book 1. P. 70.

ঘাটতি পড়িবে বলিয়া মনে হয়। এদিকে এখন ঋণ করিয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করিলেও ভারত সরকারকে যে একদিন সেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে একথা বলাই বাহুল্য। এই দুঃসময়েও নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারতসরকার যে অবহিত নহেন, ইহা দেখিয়া আমরা হতাশ হইরা গিয়াছি। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডকে এই দুর্দ্দিনেও ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ৭ পাউণ্ড ১১ শিলিং দরে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ কিনিয়া ভারতের খোলাবাজারে ১৬ শিলিং দরে বিক্রয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বাহিরের প্রতিষ্ঠানকে এভাবে শোষণ করিতে দিয়া ভারতের আর্থিক সঙ্গতি বিপন্ন করিবার দুর্লভ যে যুক্তিই ভারত সরকারের থাক, ভারতের স্বার্থ যে ইহাতে বিপন্ন হইতেছে এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ১৯৪৩-৪৪ সালে তিনগুণ বেশী টাকার ডিফেন্স লোন বিক্রয় করিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ভারত সরকারকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ধার দিয়াছে। এ ছাড়া প্রাইজ বণ্ড বা লটারী করিয়া ভারত সরকার টাকা তুলিতেছেন এবং অনেক টাকা পাওয়ার লোভে এদেশের লোক এই বিচিত্র ঋণপত্র কিনিতে ইতস্তত করিতেছে না। যুদ্ধের খরচের বেলা কৃপণতা করিয়া লাভ নাই সত্য, কিন্তু গত বারের যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর মার্কের দশা যদি ভারতীয় মুদ্রাগুলির হয় তাহা হইলে অর্থবান শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়দের স্বার্থ হানি হওয়ার দরুণ সরকারী শাসন-শৃঙ্খলা অবশ্যই বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

একদিকে আমাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক বনিয়াদ যখন এইভাবে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, যে অর্থ আমাদের নামে ইংলণ্ডে জমা হইতেছে তাহার মূল্যও যুদ্ধের পরে কত হইবে তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। সকলেই জানেন যে, এখানকার ৯০০ কোটি টাকার বেশী নোটের

পরিবর্ত্তে ভারত সরকারের কোষাগারে মাত্র ৪৪'৪১ কোটি টাকার সোনা জমা আছে। এই স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণতুল্য ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জমা রাখিবার যে বিধানটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে ছিল, তাহার লজ্জাকর সুবিধা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দীর্ঘদিন যাবৎ দৈনিক প্রায় এককোটি টাকার নোট ছাপিয়া আসিয়াছে এবং সেই নোটের পরিবর্ত্তে ভারতের পাওনা হিসাবে ইংলণ্ডে যে ষ্টার্লিং বণ্ডের পাহাড় জমিতেছে তাহার হিসাব রাখিতেছে। অবশ্য ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট ছাপাইবার পরিমাণ কিছু কমিয়াছে সত্য, কিন্তু যে পরিমাণ নোট বাজারে ইতিমধ্যেই বাহির হইয়াছে তাহার পশ্চাতে স্বর্ণ-ভাণ্ডার না থাকায় ভারত সরকারের মুদ্রানীতির প্রতি জনসাধারণ শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছে। ১৯৪৪ সালের ১৯শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু-বিভাগের বিবরণীতে মুদ্রা তহবিলের নিম্নোক্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে :—

মুদ্রিত নোট—
ব্যাঙ্কে জমা আছে—১১, ৫৩, ২২, ০০০ টাকা
বাজারে ছাড়া হইয়াছে—৯০৯, ৬৩, ৭৯, ০০০ টাকা
মোট—৯২১, ১৭, ০১, ০০০ টাকা ;

—এবং ইহার পরিবর্ত্তে জামিন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি—

স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ থান—	৪৪, ৪১, ৪৩, ০০০ টাকা
ষ্টার্লিং সিকিউরিটি—	৮০৪, ৮৩, ৯৬, ০০০ টাকা
এক টাকার মুদ্রা—	১৩, ৫৮, ৯৯, ০০০ টাকা
রুপি সিকিউরিটি—	৫৮,৩২,৯৯,০০০ টাকা
মোট—	৯২১,১৭,০১,০০ টাকা।

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট ৯২১, ১৭,০১,০০০ টাকা দায়ের পরিবর্ত্তে তাহার কোষাগারে মাত্র ৪৪,৪১, ৪৩, ০০০ টাকার স্বর্ণ জমা আছে। বর্ত্তমানের দরে এই স্বর্ণসম্পদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেও ইহার দাম ১৫০ কোটি টাকার বেশী হইবে না। ইহা ছাড়া বাজারে চলতি নোটের প্রধান জামিন ৮০৪,৮৩,৯৬,০০০ টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। এই ষ্টার্লিংয়ের সহিত ভারতীর মুদ্রার বাধ্যতামূলক সম্পর্ক থাকিলেও পৃথিবীর মুদ্রাবাজারে ষ্টার্লিংয়ের দর নামাওঠা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের আর্থিক দৌর্ব্বল্যের চাপে ষ্টার্লিংয়ের দাম পড়িয়া যায়, ভারতকে বাধ্য হইয়া তাহার ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা কম অর্থ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে। ১৯৩১ সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ইংলণ্ডের আর্থিক সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ায় ষ্টার্লিংয়ের দর পড়িয়া গিয়াছিল। এবারের যুদ্ধে ব্রিটেন প্রায় অর্দ্ধেক বৈদেশিক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থার যুদ্ধের পরে আবার ষ্টার্লিংয়ের দাম পড়িয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। তাছাড়া গতবারের যুদ্ধের মত দানের খাতায় স্বাক্ষর করিয়া পাওনা টাকার একাংশ শেষ পর্য্যন্ত আমরা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইব কিনা তাহাও বলা যায় না। যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের পক্ষে দেনা শোধ দিবার অবস্থা যদি না থাকে, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধের কথা দীর্ঘকালের জন্য মুলতুবী রাখাও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। এই সব নানা কারণে ভারতবর্ষের নামে জমা ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সমূহ যথাসত্বর কাজে লাগাইবার জন্য তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের পথ অপেক্ষাকৃত বিপদমুক্ত হওয়ায় অনেকে প্রস্তাব করিতেছেন যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটিগুলির পরিবর্ত্তে ভারতে যন্ত্রপাতি পাঠান হউক এবং সেই যন্ত্রে ভারতে

শিল্পোন্নতি হইলে ভারতের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। অনেকের মতে ব্রিটেন যেমন ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়াকে স্বর্ণ দিয়া দেনা শোধ করে, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অভাবের নজীর দেখাইয়া সেই নীতি না মানার কোন অর্থ হয় না। ষ্টার্লিং সিকিউরিটিগুলি অবিলম্বে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া ভারতে পাঠান হউক ইহাই অধিকাংশ ভারতবাসীর ইচ্ছা।

বাস্তবিক স্বর্ণের সহিত সম্পর্কহীন ষ্টার্লিংয়ের অধীনে ভারতের মুদ্রানীতিকে রাখিয়া দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের উচিত নহে। ষ্টার্লিং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যত গৌরবই থাকুক, অগাধ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জমিয়া যাইবার পর এ ব্যবস্থার অসুবিধাটুকু আমাদের কাছে আজ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। স্যার রামস্বামী মুদালিয়র প্রমুখ বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী অবশ্য ষ্টার্লিংএর ভবিষ্যৎ আমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইবে না বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বেসরকারী বিশেষজ্ঞগণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটিগুলি যথাসত্বর স্বর্ণ অথবা পণ্যে রূপান্তরিত করিবার মত প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকারের বহু আশাবাদী প্রচারেও ভারতের জনসাধারণের দুর্ভাবনা ঘুচিতেছে না। জগতের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপনে আমেরিকার আন্তরিকতা এতদিন ভারতবর্ষ বিশ্বাস করিত, কিন্তু ব্রেটন উডস্ আন্তর্জ্জাতিক অর্থ নৈতিক সম্মেলনে ভারতের পাওনা ফিরিয়া পাইবার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যে সকল প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, আমেরিকার প্রতিনিধিরা সেই সকল ন্যায্য দাবী সমর্থন করেন নাই। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে লর্ড কিনেস বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনের আর্থিক ক্ষতির কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং উপস্থিত নিঃস্ব হইলেও ব্রিটেন ভারতের পাওনা ফাঁকি দিবেনা বলিয়া মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন, কিন্তু রক্ষণশীল দল এখন

হইতে কংগ্রেসের হাতে টাকা পড়িলে ভারতের দুর্দ্দশা বৃদ্ধির যে ধুয়া তুলিয়াছেন, সেই মনোবৃত্তিই হয়তো শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্য অর্থ হইতে দুর্ভাগ্য আমাদের বঞ্চিত করিবে।

যুদ্ধের পরে আমেরিকার দেনা শোধ করা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বিরাট দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইবে। আমেরিকা ভারতকে সমরোপকরণ যোগাইয়াছে, শোধ দিবার সময় ভারতের পক্ষে কৃষিপণ্য বা খনিজ সম্পদ দিয়া সে দেনা শুধিতে হইবে, কারণ ভারতে এখনও শিল্পোন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। আমেরিকার এই দেনার জন্যও অনেকে ষ্টার্লিং সিকিউরিটিগুলির পরিবর্ত্তে যন্ত্রপাতি আনিয়া ভারতের শিল্পপ্রসার করিতে চান। আমেরিকা যত যুদ্ধই করুক, বিশ্ববাণিজ্যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদাই তাহার লক্ষ্য। যুদ্ধ বাধিবার প্রথম দিকে নিরপেক্ষ আমেরিকার পক্ষে ব্যবসা চালাইবার সুবিধা ছিল যথেষ্ট, এই সময় তাহার সমস্ত আদান-প্রদান ১৯৩৯ সালের ৪ঠা নভেম্বরের নিরপেক্ষ আইন (Neutrality Act) অনুসারে নগদ টাকায় চলিতে থাকে এবং ইউরোপের যুদ্ধের জন্য মিত্রশক্তি তাহার নিকট হইতে যাহা কিছু কিনিত, সেই সকল মাল পাঠাইবার জাহাজের দায়িত্ব পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তখন গ্রহণ করে নাই। তাহার পর ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া আসিল, অথচ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের হাতে পরাজয়ের পর এবং হিটলারের বিশ্ববিজয় পরিকল্পনায় বাধা দিবার জন্য যুদ্ধ চালাইবার প্রয়োজন আমেরিকার পক্ষে যখন অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না, তখন হইতে নিরুপায় হইয়া আমেরিকা ঋণ ও ইজারা আইন সৃষ্টি করিয়া মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে ধারে মাল দিতেছে। এই ঋণ ইজারা অনুসারে প্রাপ্ত পণ্যের দেনা শোধের দিন এখন নয়, ভবিষ্যতে। সেদিন পণ্যাদির দাম

টাকায় শোধ দিবার দরকার নাই, জিনিসের পরিবর্ত্তে জিনিস দিয়া সেদিন দেনা শোধ দেওয়া চলিবে। এখন ধার দিবার বেলায় অবশ্য আমেরিকার মৌখিক ঔদার্য্যের অভাব নাই। আপেক্ষিকভাবে এই আইন জগতের যত কল্যাণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইতে থাকুক, ইহার আসল উদ্দেশ্য আমেরিকান জনসাধারণের ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভ্রম এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি। এই যুদ্ধে আমেরিকা কম বিপন্ন নয়, ফ্যাসিষ্ট-শক্তি ধ্বংস করিতে না পারিলে আমেরিকার ধনজনের নিরাপত্তা এই রাষ্ট্রের পরিচালকগণ রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এইজন্যই ঋণ ও ইজারা বিল উত্থাপনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল,—It (The land lease programme) is an integral part, a key-stone, in our great national effort to preserve our national security for generations to come crushing the disturbers of our Peace." স্বার্থত্যাগের আভাস যদিও এই উক্তির মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু ইহার আসল কথা আমেরিকার স্বার্থরক্ষা। তাছাড়া এ সম্বন্ধে যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মনে ভ্রান্ত ধারণা না জন্মায় এবং তাহারা না মনে করে যে তাহাদের অর্থ অন্যজাতিকে সাহায্য করিবার নামে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, সেইজন্য সরকার পক্ষ হইতে আরও বলা হয়:—"We are not furnishing this aid as an act of charity or sympathy, but as a means of defending America. We offer it because we know that piece-meal resistance to aggression is doomed to failure" প্রত্যক্ষভাবে যদিও ঋণ-ইজারা আইন প্রণয়নে আমেরিকার ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে ইহারই ফলে হয়তো ইংলণ্ডকে আমেরিকার কাছে

জগতের উপর মাতব্বরী করিবার অধিকারটুকু বন্ধক দিতে হইবে। গ্রেডী মিশনের ভারতসফরের সময় ডাঃ গ্রেডী এই ঋণ ও ইজারা আইন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—Lease and lend is a form of credit or barter by which the U. S. gave something immediately and then would get paid in commodities when the commodities are in a position to meet the credit. যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ডাঃ গ্রেডীর এই উক্তি যদি কার্য্যকরী হয় এবং ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার সত্যকার ক্ষমতা যদি সেদিন আমেরিকার হাতে থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ড তাহার বিরাট দেনা কেমন করিয়া শোধ করিবে জানি না, কিন্তু আমাদের মত যে দেশ সব দিক হইতে পরমুখাপেক্ষী এবং বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিতে দেনায় যাহার গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষেই বা আমেরিকার মত শক্তিমান মহাজনকে সেদিন কি দিয়া থামাইয়া রাখা সম্ভব হইবে ? ১৯৪০-৪৫ সাল অবধি আমেরিকার ঋণ-ইজারা আইনে ভারতে প্রেরিত পণ্যের দাম হইবে ৩৫০ কোটি টাকা। কেবলমাত্র তৃতীয় বৎসরে ঋণ ও ইজারা চুক্তি অনুসারে আমেরিকা হইতে ভারত-বর্ষে ৫৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৬ হাজার ডলার (১০০ ডলারের মূল্য ৩৩২৸০ আনা) মূল্যের পণ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পণ্যের শতকরা ষাট ভাগ সমর-সম্ভার। অবশ্য এদেশে আমেরিকার সৈন্যগণ যে সকল সুবিধা পাইতেছে, তাহার একটা আনুমানিক মূল্য ভারতের নামে জমা হইতেছে সত্য, কিন্তু এই প্রতিদানমূলক ঋণ ও ইজারা বাবদ ভারতের পক্ষে এমন কোন পরিমাণ জমা হওয়া সম্ভব নহে যাহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের দেনা শোধ হইয়া যাইতে পারে। ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারত হইতে এভাবে আমেরিকাকে মাত্র

১১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫১ হাজার ডলার সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, এই যুদ্ধ পরিচালনার অনিবার্য্য অবসাদে যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দিকে তাহার অবস্থা আরও অসহায় হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডও যে যুদ্ধ থামিতে না থামিতেই ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে স্বর্ণ বা পণ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে এরূপ আশা করা সঙ্গত নয়। ব্রিটেনের পাওনাদার ভারতবর্ষ হয়তো সেদিন অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু ভারতবর্ষের পাওনাদার আমেরিকা যদি বিলম্ব করিতে সম্মত না হয়, সেদিন তাহার মুখ আমরা কি দিয়া বন্ধ করিব? জগতের মোট স্বর্ণ ভাণ্ডারের প্রায় ৮০ ভাগ সোনা আমেরিকার হাতে, তাহাদের সম্ভ্রম আজ যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিকে অস্বীকার করা পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব হইবে না। ভারতের নিকট হইতে আমেরিকা সেদিন যদি ঋণের দাবীতে পণ্য ফেরৎ চায়, এদেশের কাঁচামাল জাহাজ বোঝাই করিয়া পাঠাইয়া সেদিন আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধজয়ে ভারতের অনেক স্বার্থ থাকিলেও ভবিষ্যতের এই দুর্দ্দিনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহার উচিত কোন কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন করা। ভারতবর্ষ যে স্বর্ণ বা রৌপ্য দিয়া আমেরিকার দেনা শোধ করিবে সে আশাও কম। ১৯৪২ সালে পৃথিবীতে যখন মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তখন ভারতের খনিতে উঠিয়াছিল মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার আউন্স এবং ঐ বৎসর পৃথিবীর মোট উত্তোলিত ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স রৌপ্যের মধ্যে ভারতের খনি হইতে মাত্র ২২,৪৬৬ আউন্স রৌপ্য উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় ভবিষ্যতের বিপদ এড়াইতে যুদ্ধের অপরাপর ব্যয়ের মত ঋণ ও ইজারার দরুণ প্রাপ্য জিনিসগুলির দাম আলাদা করিয়া রাখা ভারতসরকারের বিশেষ

কর্ত্তব্য। ঋণ ও ইজারা আইনের সাহায্য লওয়া অর্থাভাবের জন্য নহে, পণ্যাভাবের জন্য। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগে অথচ এদেশে পাওয়া যায় না, এমনি পণ্য ঋণ-ইজারা আইন অনুসারে ভারতে পাঠান হইতেছে। এখনও যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে শিল্প-প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ দেন, তাহা হইলেও স্বাবলম্বী হইবার গৌরবে আমরা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার কতকটা ব্যবস্থা করিতে পারি, কিন্তু ভারতসরকার ভারতসম্বন্ধীয় বর্ত্তমান নীতি যদি শেষ পর্য্যন্ত জোর করিয়া আঁকড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরের স্বার্থপরতাজনিত দুর্ভাগ্য ভারতবাসী সেদিন কেমন করিয়া বহন করিবে কে জানে ?

ভারতরক্ষার নামে আজ আমেরিকা শুধু সমরোপকরণই পাঠায় নাই, সৈন্যও পাঠাইয়াছে অসংখ্য। ভারতের নানা স্থানে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র আমেরিকান সৈন্যের ছাউনি পড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদল নগর বসাইতেছে, বিরাট বিরাট কারখানা তৈয়ারী করিতেছে। আমেরিকানদের অধীনে যাহারা চাকুরী পাইতেছে, তাহারা একমাসে যে টাকা রোজগার করিতেছে, তাহা তাদের অনেকের যুদ্ধের পূর্ব্বের এক বৎসরের উপার্জ্জনের সমান। মাঠ বা জঙ্গলের মাঝে বিরাট বিরাট কারখানা আর শহর গড়িয়া আমেরিকা ভারতবাসীকে আজ শুধু ঐশ্বর্য্যই দেখাইতেছে না, অর্থবিতরণের ব্যবস্থাও করিতেছে। নানাপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র, মোটর গাড়ী ও বিমান তাহারা যে কত আনিয়াছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। এ ছাড়া ভারতের বাণিজ্য-বাজার দখল করিবার দিকেও আমেরিকা কম নজর দেয় নাই। যুদ্ধ শেষ না হইতেই আমেরিকা এদেশে ব্যবসাদারী ফন্দিফিকির চালাইতে শুরু করিয়াছে এবং ভারতে আমেরিকার

মালের আমদানী যেভাবে বাড়িতেছে, এদেশের সহিত ইংলণ্ডের ক্রমহ্রাসমান বাণিজ্যের পক্ষে তাহার ফল গুরুতর হইবে। যুদ্ধের সময় নানা স্বার্থের খাতিরে আমেরিকার এ সব বাণিজ্যিক আগ্রহে ইংলণ্ড বিশেষ আপত্তি জানাইতেছে না সত্য, কিন্তু যুদ্ধের বিপদ কাটিয়া গেলে এবং শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের বাঁচিবার সমস্যা স্বরূপে প্রকাশিত হইলে এই ভারতের বাজার লইয়াই ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য ব্রিটেন যাক বা আমেরিকাই আসুক, আমাদের বাণিজ্যক্ষেত্র আমাদের হাতে না আসিলে ভারতের তাহাতে বিশেষ লাভ ক্ষতি নাই। তবু বহুদিনের পরিচয়ের নিবিড়তায় ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হইয়াছে, ভারত সরকার শিল্পের দিক হইতে আমাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সুযোগ দিলে সেই ঘনিষ্ঠতার দরুণ পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা ব্রিটেনকে ভারতের বাজারে অধিক বাণিজ্য-সুবিধা দিতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনযন্ত্র না পারুক, ভারতের জনসাধারণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেই।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের ঢেউ যখন ভারতের প্রান্তভাগে আসিয়া লাগিল, তখন হইতেই বলিতে গেলে এদেশে দৈন্যের তীব্রতা ও মানসিক উদ্বেগ শুরু হইয়াছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এখানে শতকরা ৮০ জন কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। শিল্পোন্নতি এখানে সরকার ও জনসাধারণের ঔদাসীন্যে সম্ভব হয় নাই এবং জনসংখ্যার যে শতকরা (১০·২) ভাগে লোক শিল্পকর্ম্মে নিয়োজিত, তাহারাও অদক্ষ ও অসংঘবদ্ধ বলিয়া মাথাপিছু মাত্র বার টাকা হিসাবে রোজগার করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-শ্রমিকদের মাথা পিছু আয়

৮৩০ টাকা, ব্রিটেনের ৪৬৩ টাকা ও জাপানের ১৬০ টাকা। কৃষিক্ষেত্রের সহিত একান্নবর্ত্তী পারিবারিক জীবনের যে মোহ ভারতীয় কৃষকদিগের মনে শিকড় গাড়িয়াছে, তাহারই জন্য কৃষক সহজে ক্ষেত ও আত্মীয়-পরিজনদের মায়া ছাড়িয়া জীবিকা সংস্থানের চেষ্টায় বাহিরে যাইতে চায় না। পুরুষানুক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বাভাবিক নিয়মে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে এবং অতীতকালে চলিলেও সমগ্র দেশবাসীর কৃষিক্ষেত্রের আয়ে এখন আর চলে না। অবশ্য বিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম্ম চালাইলে এদেশেও কি হইত বলা যায় না, হয়তো বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বাড়াইয়া এবং প্রায় ১১ কোটি একর পতিত জমি চাষ করিয়া ভারতের পক্ষেও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব হইতে পারিত; কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে সরকারী নিশ্চেষ্টতায় ভারতীয় কৃষক এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পড়িয়া আছে এবং কৃষিবিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতির সহিত তাহার আজও পরিচয় ঘটে নাই। ১৯২৯ সালে ভারতে প্রতি-একর জমিতে যে পরিমাণ ধান জন্মিত, এই ১৪ বৎসরের মধ্যেই তাহার প্রায় ১/১০ অংশ উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে জাপানে এই সময় উৎপাদন বাড়িয়াছে প্রায় ১/৯ অংশ। কৃষির জন্য ভারতসরকারের পক্ষ হইতে লোকদেখানো চেষ্টা কিছু কিছু হইয়াছে সত্য, কৃষিঋণের জন্য কতক-গুলি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কিছু কিছু আইনও হইয়াছে। তবে এ-সমস্তই এত সংকীর্ণ সীমায় সমাধিলাভ করিয়াছে যে ১৫,৮০,০০০ স্কোয়ার মাইল পরিধিবিশিষ্ট দেশে কৃষকের পক্ষে সারা দেশবাসীর মুখে খাদ্য জোগানো এখন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে নানা আশার বাণী শুনিবার মত আমরা শুনিয়াছি যে রাসায়নিক সার এ্যামোনিয়াম সালফেটের কয়েকটি কারখানা ভারতে খোলা হইবে

এবং মহীশূরে প্রথম কারখানা খুলিবার পরিকল্পনা নাকি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এখন বা ইহার পরে যাহাই করা হউক, ভারতীয় কৃষকদের জন্য ভারত সরকার এতকাল বিশেষ কিছু করেন নাই বলিয়াই ভারতের প্রয়োজনীয় খাদ্যাদির শতকরা ২½ ভাগ বাহির হইতে আনিতে হয়। শুধু বার্ম্মা হইতে ভারতে যে চাউল আমদানী হইত তাহার ওজন ছিল ২০ লক্ষ টন এবং তাহার আনুমানিক মূল্য ছিল ৩০ কোটি টাকা। যুদ্ধের জন্য বাহিরের খাদ্য আমদানী বন্ধ হইয়া গেলেও ভারতে বাহির হইতে অনেক জনসমাগম হইয়াছে। ইহার উপর চোরাবাজারের উৎপাত জুটিয়া ভারতের খাদ্য-ব্যবস্থায় মহা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে এবং যুদ্ধের মরণ ভীতির বহু উপরে এই সবের জন্য আমাদের দুঃখ চলিয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ সালের মম্বন্তরের ভয়াবহতা বর্ণনা করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে বিলাতের ইকনমিস্ট পত্রিকাও স্বীকার করিয়াছেন : 'So critical the conditions created by the high prices and black market appear that the problem of the cost of living threaten to overshadow the war itself.

১৯৩১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৪১ সালে ইহা বাড়িতে বাড়িতে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষে পৌছিয়াছে। ইদানীং প্রতি বৎসর গড়ে ভারতবর্ষে লোক বাড়িতেছে প্রায় ৫০ লক্ষ। এই বিরাট জনমণ্ডলীকে বাঁচাইবার দায়িত্ব যাঁহাদের ছিল, এখানকার অধিবাসীদের জন্য কিছু করিবার প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, তাই ভবিষ্যতের বিপদ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া তাঁহারা বর্দ্ধিষ্ণু অভাব অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, বার্ম্মা প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্য আমদানী করিয়া মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় সমরপণ্যোৎপাদন-কেন্দ্রের শ্রমিক, সৈন্য ও বন্দীদের প্রতি প্রথমকর্ত্তব্য পালন করিতে

একদিকে গভর্ণমেণ্ট যেমন স্বার্থপর ক্ষিপ্রতায় বাজারের মাল ভাণ্ডারজাত না করিয়া পারিলেন না, অন্যদিকে তেমনি অর্থশালী ব্যক্তিগণ ভয়ে ও ভাবনায় বাজারের খাদ্যবস্তু এমনভাবে ঘরে তুলিয়া লইলেন যে যোগান ও চাহিদার মধ্যে বিরাট অসামঞ্জস্য ঘটায় পণ্যমূল্যরেখা সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। এই সময় বহু লোকের পক্ষে খাদ্যসংগ্রহ করা অসম্ভব হওয়াতে বাজারে অধিক দামে জিনিস পাওয়া গেলেও মানুষ উপবাস দিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে বাংলার গভর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্ট ও ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর আমলে একটু সরকারী দূরদৃষ্টি এবং সহানুভূতি থাকিলেই বাংলার দুর্ভিক্ষ রোধ করা সম্ভব ছিল বলিয়া অনেকে মতপ্রকাশ করিয়াছেন। যতদিন নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ছিল এবং যুদ্ধের জন্য বেসরকারী প্রয়োজনে মালগাড়ীর সঙ্কোচ হয় নাই, ততদিন বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহারও মনেই সন্দেহ জাগে নাই। অবশেষে মন্বন্তর যখন ভয়াবহ হইয়া উঠিল এবং দুর্ভিক্ষপীড়িতের কাতরক্রন্দনে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া দেশী ও বিদেশী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবার পর তখন ভারতসরকার এদিকে দৃষ্টি দিবার সময় পাইলেন! কিন্তু সে সময় মন্বন্তর ও মহামারী সারাদেশে করাল রসনা বিস্তার করিয়াছে, জাপানী বিমান-বহরের আক্রমণের উদ্বিগ্নতার চেয়ে অন্নের সমস্যা তখন প্রবল বলিয়া গ্রাম শূন্য করিয়া তখন দলে দলে নিরন্ন নরনারী সমৃদ্ধ শহরগুলিতে আসিয়া ভিড় জমাইতেছে। অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে ১৯৪৩ সালের ৮ই আগস্ট স্টেটসম্যান সম্পাদক লিখিলেন—The condition of Bengal is conspicuously bad as to call for heroic remedies. New Delhi must bestir itself, must think less in terms of

N. W. India's easier conditions and take due cognizance of bitter realities in the war threatened Eastern areas, where what fairly now be called famine prevails.

শুধু শাসনতান্ত্রিক ত্রুটি ও কর্ত্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতা ছাড়া এই দুর্ভিক্ষের আর কোন বিশেষ কারণ নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য আমদনী বন্ধ হইয়া শতকরা ১০ ভাগ খাদ্যও যদি কম পড়িয়া থাকে তাহা হইলেও ৩০।৩৫ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মরিতে পারে ইহা সত্যই কল্পনা করা যায় না। একদিকে যেমন বণ্টনের সমতা রক্ষিত হয় নাই, যাহাদের হাতে খাদ্যব্যবস্থা পরিচালনার ভার ছিল তাহাদের অকর্ম্মণ্যতার জন্যও খাদ্য রহস্যজনক ভাবে বাজার হইতে উধাও হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হইবার মত প্রাকৃতিক কোন দুর্য্যোগ ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই, মেদিনীপুরের প্লাবনে যত ক্ষতিই হইয়া থাকুক, সারা দেশে মন্বন্তর সৃষ্টির পক্ষে তাহা অবশ্যই যথেষ্ট কারণ নহে। মানুষের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ৩১শে অক্টোবরের স্টেটসম্যান ঠিকই লিখিয়াছিলেন—"As we have often observed, India has been lucky that her man-made famine has so far remained uncomplicated by any failure of the monsoon.

এই দুর্ভিক্ষের দিনেও বাংলায় খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে সিন্ধু সরকার অন্যায় লাভ করিয়াছেন। বাংলা সরকার স্বয়ং অন্য সাহায্যভাণ্ডারের নামে পণ্যমূল্য নামিতে না দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও বুদ্ধিমান লোক সমর্থন করিবেন না। পাঞ্জাব হইতে ১০ টাকা ৪ আনা দরে কেনা গম বাংলায় ১৭ টাকা মণ দরে বিক্রী হওয়ায় দরিদ্র

এবং মধ্যবিত্তদের দুঃখ বাংলা সরকারের এই নিবু্দ্ধিতার জন্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্যানাডা ভারতে খাদ্যসামগ্রী পাঠাইতে রাজী ছিল, কিন্তু জাহাজের অভাবে সেই খাদ্য এদেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। নিত্য নূতন আইন সৃষ্টি করিয়া ও তাহা প্রত্যাহার করিয়া দুর্ভিক্ষের সময় শাসনকর্তৃপক্ষ অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। স্বার্থহীন সুশাসনের অভাবে কোন প্রাকৃতিক বড় দুর্য্যোগের সম্মুখীন না হইয়াও ১৯৪৩ সালে বাংলায় এতবড় দুর্ভিক্ষ হইল, অথচ ১৮৭৩-৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের বহু কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং অসংখ্য লোক ইহার কবলে পড়িলেও সরকারী সুনীতি ও শৃঙ্খলার সাহায্যে সেই দুর্ভিক্ষ শেষ পর্য্যন্ত রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল। তখনকার বাংলার গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল 'Men and Events of my time' গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—"The Famine of 1874 was over, the deaths from starvation were so few compared to many millions concerned, that practically there had been no loss of life. The health of the people had been sustained, agriculture was unimpaired, the resources of the country remained uninjured, even the revenues were nearly all realised. But there had been a large expenditure which how·ever had been exactly foreseen and to which the Government had made up its mind beforehand." এই বিবৃতি পাঠের পর আমারা শুধু এই কথাই ভাবি, তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বাংলা যাঁহারা শাসন করিতেছিলেন, দেশকে রক্ষা ও পালন করিবার দায়িত্ব যে তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল একথা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া?

যুদ্ধে উপর্য্যুপরি পরাজয়, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের জন্য নানা শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা ও বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিশ্বব্যাপী বিরুদ্ধ সমালোচনা—এই সকল কারণে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয়দের সম্বন্ধে বা ভারতসম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার স্থির মস্তিষ্কে কাজ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অব্যবস্থিত চিত্ত নানা আইন সৃষ্টি ও প্রত্যাহারে বাজারের উপর জুলুমবাজী করিয়া মানুষের দুর্দ্দশা বাড়াইয়া দিয়াছে, দেশরক্ষার আয়োজনের নামে দেশের শিল্পপ্রসার সম্ভব হইতে না দিয়া অগণিত নরনারীর স্থায়ী অন্নসংস্থানের পথ তাঁহারা রুদ্ধ করিয়াছেন এবং দেশের মুদ্রানীতি যেভাবে পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধের পরেও মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। সোনার লোভনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তেরা অভাবে পড়িয়া সঞ্চিত সামান্য সোনা বেচিয়া ফেলিয়াছিল এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সূক্ষ্ম ফাঁকটুকুর সুবিধা লইয়া কাগজের জামিনে কাগজী নোটের পর্ব্বত সৃষ্টি করাতে সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য বাজার হইতে উবিয়া গিয়াছিল। মুদ্রার সামান্য পরিমাণ রৌপ্য বৈদেশিক বিনিময় প্রভৃতি কাজে লাগাইবার জন্য ভারতসরকার মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড মার্কা স্ট্যাণ্ডার্ড টাকা ও আধুলি ১৯৪৩ সালের ১৫ই মে হইতে এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা স্ট্যাণ্ডার্ড টাকা ও আধুলি ১৯৪৩ সালের ১লা নভেম্বর হইতে প্রচলন রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। যুদ্ধ শুরু হইবার সময় বাজারে প্রায় ২৫৫ কোটি টাকার রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা ছিল ৭৫·৮৭ কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা। এই ৩৩১ কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা কাগজী নোটের পাশাপাশি থাকিয়া সেদিন মুদ্রানীতির যে সম্ভ্রম সৃষ্টি করিয়াছিল আজ বিলাতী স্টার্লিং কাগজ বিল পর্ব্বতপ্রমাণ

নোটের পিছনে থাকিয়া দেশবাসীর সেই শ্রদ্ধা কি দাবী করিতে পারে ? যুদ্ধের অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ জানিয়াও দেশবাসী এই কাগজী মুদ্রানীতিকে সমর্থন না করিয়া পারে না ; সহানুভূতি ও নিরুপায় ভাব—দুই বৃত্তিই এই মুদ্রানীতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ; যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যখন বৈদেশিক বাণিজ্য এখানে পুরোদমে চলিতে শুরু করিবে তখন গভর্ণমেণ্টের অসচ্ছলতায় জনসাধারণের বিশ্বাস আহত হইলে সেই বিশ্বাস ফিরাইবার উপায় কি ? অবশ্য দেশের সীমান্তে যখন যুদ্ধ চলিতেছে তখন জনসাধারণ ত্যাগস্বীকার করিতে বাধ্য এবং আভ্যন্তরীণ অসুবিধা তখন অবশ্যই বড় কথা নয়, কিন্তু এ দুর্দ্দিন শেষ হইলে আমাদের আর্থিক বনিয়াদ কতখানি দৃঢ় থাকিবে তাহা এখন হইতে জানিবার ইচ্ছা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আমাদের মত জানার প্রয়োজন মনে করা হয় না, জাপানী আক্রমণে বাধা দিবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও ভুয়ো আত্মসম্মান বজায় রাখিবার মোহে এদেশের শাসক-সম্প্রদায় কংগ্রেস-নেতাদের কারাগারে আবদ্ধ রাখেন ; সুতরাং যুদ্ধোত্তর দিনগুলিতে আমাদের অসুবিধায় বাহিরের কেহ ভাগ লইতে আসিবে না জানিয়া আমাদেরই এ সম্বন্ধে এখন হইতে সজাগ থাকা উচিত।

রাশিয়া ও আমেরিকার সাহায্যে যথেষ্ট সময় পাইয়া ইংলণ্ড এখন যুদ্ধে বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। জার্ম্মানী যদি সম্মিলিত শক্তির কাছে ইউরোপে পরাজিত হয়, পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপান একা মিত্রপক্ষের সহিত অধিক দিক যুদ্ধ চালাইতে পারিবে না বলিয়াই অনেকে মনে করেন। জাপানের সহিত ব্যাপক ভাবে বোঝাপড়া আরম্ভ হইলেই সমরায়োজনের সমারোহের চাপে ভারতের বর্ত্তমান দুঃখ আরও বাড়িয়া যাইবে। যুদ্ধের এই পাঁচ বৎসরে যে অভাব ও কষ্ট আমরা সহিয়াছি তাহাতেই

আমাদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, ইহার উপর নূতন দুর্ভোগ সহিতে হইলে আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ। অদৃষ্টবান আমাদেরই জনকয়েক দেশবাসী যুদ্ধের মুনাফাভোগ করিয়া কাগজী মুদ্রার বাহুল্যটুকু নিজেদের সিন্ধুকজাত করিবার সাধনা করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা একাংশও নয় এবং তাহাদের লক্ষপতি হওয়ার ফলে কুবেরের ঐশ্বর্য্য বাড়িতেছে, লক্ষ্মীর পূজা হইতেছে না। বাণিজ্য-বিস্তৃতি করিয়া দশজনের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব যাহারা লইতে পারিত তাহারা টাকা জমাইতেছে ব্যাঙ্কের খাতায়, এদিকে তাহাদের সচ্ছল চাহিদার চাপে বাজারের পণ্য সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়া অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে। এই ভাবে মুদ্রাসম্প্রসারণের সাময়িক সুবিধা ভারতের সবলোকের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইতেছে না।

অথচ এই যুদ্ধের মধ্যে পরিবর্ত্তনের বিরাট সুযোগ ছিল। সমুদ্র-পথ বিপদ-সঙ্কুল হওয়ায় আমদানী রপ্তানী বন্ধ, বিদেশী জিনিস আসা-যাওয়া নাই বলিয়া এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে এদেশবাসীর অভাব ঘুচানোর ব্যবস্থা করা শুধু নীতির দিক দিয়া নয়, প্রয়োজনের দিক দিয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সক পণ্য এদেশে উৎপন্ন হয় তাহাদের পরিমাণ দরকার মত বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব জিনিস বাহির হইতে আনিয়া আমাদের অভাব মিটানো হইত, সেগুলি তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করাও বিশেষ উচিত ছিল। সব দেশের গভর্ণমেণ্টই অভাবের এই দুর্লভ সুবিধা গ্রহণ করেন এবং সাধ্যমত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া দিয়া ও কাঁচামাল জোগাইয়া নূতন শিল্পগঠনের ও পুরাতন শিল্প প্রসারের সুযোগ করিয়া দেন। এমনি করিয়া গতবারের যুদ্ধে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। এবারের যুদ্ধে ভারতসরকার প্রথম

হইতেই অপ্রস্তুতির অজুহাতে দেশের সমস্ত কর্ম্মক্ষমতা সমরোপকরণ উৎপাদনে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার সঙ্কুচিত করিবার উপদেশ দানে পর্য্যন্ত ভারত সরকারের ক্লান্তি ছিল না। যাহারা যুদ্ধের দৌলতে ভারতের ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বিরাট সম্ভাবনার কথা বুঝাইতে গিয়াছিলেন এবং সমরোপকরণ উৎপাদন ব্যাহত না করিয়াও এই শিল্প-সংস্কার সম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারত সরকার শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নানা কৌশলে থামাইয়া দিয়াছেন। তামা, পিতল, লৌহ প্রভৃতি ধাতু প্রথম হইতেই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আটকাইয়া ফেলা হইয়াছিল এবং দেশবাসীর সাংসারিক অভাব মারাত্মক হইবার নামে মাঝে মাঝে সামান্য পরিমাণ ধাতু বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টা, বিশেষ করিয়া নূতন পরিকল্পনা, এই সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে অত্যন্ত আহত হয় এবং অনিশ্চিত জোগানের দায়িত্ব লইয়া কারবার খুলিতে শেষপর্য্যন্ত অনেক শিল্পোৎসাহীই ভয় পান। এই ভাবে যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা বা শিল্পপ্রসার গভর্ণমেণ্টের অনুমতিসাপেক্ষ ছিল বলিয়া অর্থবান ভারতবাসীর পক্ষে যুদ্ধঋণ ক্রয় করা বা ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়া রাখা ছাড়া আর কিছু করিবার ছিল না; অথচ এই যুদ্ধের দৌলতে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও সামরিক সরবরাহকারীগণ প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যাঙ্কের খাতায় যে পরিমাণ টাকা জমা পড়িয়াছে, কারবার বা শিল্পাদি প্রসারিত হইবার সুযোগ না থাকায় সে অনুপাতে নিকাশ-ঘর (Clearing house) মারফৎ চেকের আদান প্রদান চলে নাই। এই সঞ্চিত অর্থস্তূপে যদি শিল্পপ্রসার সম্ভব হইত, ভবিষ্যতে মুদ্রা-স্ফীতির জন্য আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না। জনসাধারণের

বেকারত্ব ঘুচিয়া তাহারা অর্থসাচ্ছল্য লাভে সমর্থ হইলে এবং দেশের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হইলে রাষ্ট্রের পক্ষেও অল্প সময়ের মধ্যেই মুদ্রাস্ফীতির ত্রুটিগুলি শুধরাইয়া লওয়া সম্ভব হইত।

জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধঘোষণা করিয়া যখন দেশের পর দেশ জয় করিতে করিতে বিদ্যুদ্‌গতিতে ভারতসীমান্তে আসিয়া হাজির হইল, এ দেশবাসীর সাহায্যলাভের উপযোগিতা বা প্রয়োজন সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে তখন তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। জনসাধারণের মত অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া ব্রিটিশসরকার ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে রাশিয়ায় দৌত্যকার্য্যে সাফল্য-অর্জ্জনকারী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিবার জন্য ভারতে পাঠান। স্যার স্ট্যাফোর্ড অত্যন্ত অল্প অধিকার লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন এবং বলিতে গেলে যুদ্ধব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শাসনতান্ত্রিক বিষয়ের পরিচালনায় যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের অধিকার লাভের দাবীর প্রশ্ন লইয়াই কংগ্রেসের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয় এবং ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া যান। সেই সময় শুধু ইংলণ্ডের জনসাধারণ নহে, মিত্রপক্ষভুক্ত অন্যান্য দেশের লোকেরাও ভারতবাসীর সমষ্টিগত সাহায্য কামনা করিয়াছিল এবং বার্ম্মা মালয়ের মত জাপান-প্রীতি যাহাতে ভারতেও ছড়াইয়া পড়িয়া জাপানের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া না দিতে পারে, সেজন্য সকলেই সমগ্র ভারতবর্ষকে মিত্র-পক্ষের সক্রিয় সাহায্যকারীরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। আমেরিকাও তখন একান্তভাবে কামনা করিয়াছিল যাহাতে ভারতের সাহায্যে ইংলণ্ড জাপানের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিপদ-মুক্ত হয় এবং নিজেদের দেশকে হীনবল করিয়া আমেরিকান সৈন্যদের ভারতে আটকাইয়া ফেলিবার কল্পনা তখন তাহাদের কাছে বিশেষ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই।

কংগ্রেস-ক্রিপ্‌স-আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেলে সারা পৃথিবীতে কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিকৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং অনেকেই কংগ্রেসের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের শুভেচ্ছা তাহাদের অশোভনীয় জেদের জন্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কথাটা যে মিথ্যা একথা বুদ্ধিমান কেহ কেহ হয়তো বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থাগতিকে এবং ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া অতি অল্পলোকেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ব্যর্থ হইবার পরও আমেরিকার অনেকে কংগ্রেসের সহিত আপোষের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের আর একটু উদারতা আশা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক লুই ফিশার 'নিউইয়র্ক নেশন' পত্রিকায় ক্রিপ্‌স মিশন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—'Throughout the month of February, 1942, watching Japanese advance in the Far East President Roosevelt has taken a lively interest in the Indian question, and when the British Cabinet finally decided to send the Cripps Mission to India, the White House despatched to Churchill proposals for the solution of the Indian problem. President Roosevelt followed every step of the Cripps' negotiations, and when the break came on April 9, he tried to persuade Churchill to keep Cripps in India and resume the talks. But Cripps did not stay.

১৯৪২ সালে যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সম্বন্ধে উদার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে প্রস্তুত ছিল, নানা ক্ষয়ক্ষতির পর স্বার্থ-সংস্থানের অভিশাপে তাহাকে হয়তো আজ ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

না। একদিন আমেরিকার প্রভাবসম্পন্ন রাজনীতিবিদ মিঃ উইলকি বলিয়াছিলেন—'India is our problem'। তখন সে কথায় যে নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রীতির সুর ধ্বনিত হইয়াছিল, আজ ভারতে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার পর যদি সে কথা আবার উচ্চারিত হয় তবে সে বিশ্বপ্রীতির পরিবর্ত্তে তাহাতে স্বার্থের সুরই ফুটিয়া উঠিবে। আমেরিকা আজ ভারতবর্ষে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া এদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইতেছে, তাহাতে আমেরিকার ভবিষ্যৎ-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকেই আজ সন্দিহান। যুদ্ধের অন্তরালে কি মহাপ্রলয় ঘটিতেছে সে সংবাদ আমরা রাখিতে পারি না, কিন্তু আমেরিকার ভারতে অধিকার স্থাপনের মত কোন বিপর্য্যয় যদি ঘটে, তাহা আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই খুবই দুশ্চিন্তার বিষয় হইবে। রাষ্ট্রাধিকার পরিবর্ত্তনে যত কল্যাণই আসুক তাহাতে দাসত্ব মোচন হয় না। আমরা একথা কোনদিন কল্পনা করিতে পারি না যে, ইংরাজের স্থানে আবার এক নূতন জাতি আসিয়া ভারতে শোষণনীতি চালাইতে থাকিবে। বহু দুঃখ সহিয়া যদি কোনদিন আমরা ব্রিটিশ শক্তিকে সরাইতে পারি, সে দুঃখভোগ আমরা নিজেদের মুক্তির জন্যই করিব, যত ভাল শাসক-সম্প্রদায়ই হউক, কাহাকেও ইংরাজের পরিত্যক্ত আসনে বসাইবার জন্য নয়। আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য জনমত গঠন করিতে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থপর নীতির সমালোচনা করি, নিজেদের অধিকার-হীনতার ক্ষোভে মাঝে মাঝে হয়তো আত্ম-অসম্মানও করিয়া থাকি, কিন্তু ইংরাজের সহিত বিরোধের যুক্তি হিসাবে আমরা সর্ব্বদাই বলি—'স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার, শিক্ষায় মানুষের বাঁচিবার চেয়ে বেশী প্রয়োজন, ইংরাজ আপনাদের স্বার্থ রক্ষার মোহে আমাদিগকে

শিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা তাহাদের সব চেয়ে বড় অন্যায়। এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য সারা ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিবার সংকল্প এদেশে বহু মহাপুরুষ করিয়াছেন। 'India and the West' গ্রন্থের লেখক Mr. Mervin যেমন বলিয়াছেন—'India like England has won her ways through centuries to a growing sense of unity based on substantial facts of geography, history and actual conditions of life and thought'—আমরাও ভারতের এই সমগ্রতার কথা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাই। আমরা একান্ত আশা করি যে, এই সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের পরে সারা জগতে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়নের দুর্নীতির সমাপ্তি ঘটিবে এবং অকারণ লাঞ্ছনার হাত হইতে মানুষ পাইবে মুক্তি। এই কামনাই ভারতবাসীকে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের জন্য সচেষ্ট হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহার পরেও আমাদের আশা যদি ব্যর্থ হয়, যুদ্ধোত্তর ভারত যুদ্ধের পূর্ব্বেকার দিনগুলিতে তখন অবশ্যই আবার ফিরিয়া যাইবে।

ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ভূমিকা

যুদ্ধ যখনই কোন দেশে বাধিয়াছে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই দেশের জনগণকে সহিতে হইয়াছে বহু ক্ষয়ক্ষতি। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রনায়কগণ সমর পরিচালনায় এমনি ব্যস্ত থাকেন যে, সামরিক প্রয়োজন মিটানোই তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায় এবং বেসামরিক জনগণ সম্বন্ধে

মনোযোগ দিবার সময় তাঁহারা পান না। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে এবং জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, এই যোগদানের ফলে তাহার ভাগ্যেও যুদ্ধজনিত অনেক বিড়ম্বনা জুটিয়াছে। প্রথম পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে ভারতের প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, বেসরকারী জন-মণ্ডলী সাধারণভাবে প্রাণ বাঁচাইবার মত পণ্যের অভাবে চূড়ান্ত অসুবিধা ভোগ করিয়াছে, এমন কি খাদ্যশস্য পর্য্যন্ত সরকারী তাগিদে ও আমদানীর অভাবে কম পড়ায় ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে অসংখ্য লোকক্ষয়কারী ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ভারত সরকার জানেন বাংলা এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ভূভাগ, ইহার জনসাধারণকে খুশী রাখার অনেক স্বার্থ ছিল, তবু সময়ে কিছু করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া বাংলার দুর্ভিক্ষে ক্ষুধাতুরা মা মৃতপ্রায় ছেলের হাত হইতে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য কাড়িয়া খাইয়াছে, প্রকাশ্য রাস্তার উপর শহরের লক্ষ কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দলে দলে নিরন্ন করিয়াছে আত্মহত্যা।

ইউরোপের রণক্ষেত্রে জার্ম্মানীর আসন্ন পতনের অব্যবহিত পরেই ভারতের সত্যকার দুর্দ্দিন শুরু হইবে। ঘর সামলাইবার প্রয়োজন যখন একেবারেই থাকিবে না, জমিদারী রক্ষার দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তখনই সম্ভব। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল বারবার ঘোষণা করিয়াছেন যে জার্ম্মানী পরাজিত হইবার পর জাপানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া অভিযান শুরু করা হইবে। যদিও অষ্ট্রেলিয়ায় এই প্রাচ্য মহাযুদ্ধের পরিকল্পনা গঠিত হইবার কথা শোনা যাইতেছে, অন্তত যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতবর্ষকে যে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খাস জাপানে যে সকল বিমান-আক্রমণ হইতেছে,

বিমানগুলি চীনের বিমানঘাঁটিতে বিশ্রাম লইলেও ভারতবর্ষ হইতেই অধিকাংশ সময় তাহারা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া থাকে।

আগামী প্রচণ্ড যুদ্ধে ভারতবর্ষের পটভূমিকা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ভরসার কথা এই যে, সে দুর্দ্দিন বোধ হয় দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। ভারতের সামরিক অবস্থাও ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখন অনেক উন্নত। আমেরিকা ও ব্রিটেনের চেষ্টায় এখানে সমরোপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, সৈন্যও আসিয়াছে অসংখ্য। যুদ্ধে যাহাতে বেশী লোক যোগ দেয় এজন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রচারের ত্রুটি ছিল না এবং কতকটা অভাবে ও কতকটা সহানুভূতিতে ভারতবর্ষ হইতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মিত্রপক্ষের হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। মাসিক প্রায় ৭০,০০০ লোক এদেশ হইতে সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়াছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মত যুদ্ধোপলক্ষে খরচ করিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু যে দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৭৫ টাকার নীচে, সে দেশে ১৯৩৮-৩৯ সালের ৪৩·৭ কোটি টাকার স্থানে ১৯৪২-৪৩ সালে ২৫৯ কোটিতে দেশরক্ষার ব্যয় উঠিয়াছে, ইহাও নিতান্ত অগৌরবের কথা নয়। ভারতবর্ষ অত্যন্ত গরীব দেশ, এ যুগের মারাত্মক যুদ্ধায়োজন করা এমনিই তাহার পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া আক্রমণকারীকে বাধা দিতে হইলে তাহাকে নিরুপায় হইয়া পরের সাহায্য লইতে হয়। তাছাড়া ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য ভারতকে সাহায্য করিতে নীতির দিক দিয়াও বাধ্য, কারণ জাপানকে তাড়াইয়া দিতে পারিলে ভারতবর্ষ যত লাভবানই হউক, ভারতশাসক ইংরাজের লাভ তাহা হইতে অনেক বেশী। সকলের মুক্তির জন্য বহুপ্রচারিত এই সমষ্টিগত সংগ্রামে ভারত মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া নিজেদের মুক্তির দাবী বলিষ্ঠতর করিয়া তুলিতে চায় এবং তাহার

সাহায্য মিত্রপক্ষের স্বীকৃতিও পাইয়াছে। এ অবস্থায় রাশিয়ার ঐতিহাসিক জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের যে মানসিক পরিবর্ত্তন আশা করা যাইতেছে, তাহা ভারতের পক্ষে শুভ হইবে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। অবশ্য এ যুদ্ধের পরিণামেও কেহ কেহ ভারতের ভাগ্য অপরিবর্ত্তিত থাকিবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে উদার ব্রিটিশ মনোভাব আটলাণ্টিক চার্টারের রাজনৈতিক ধারাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং যে চার্টার ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া অমেরিকান ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মধ্যে কেহ কেহ আশা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মনোভাব যদি সত্যই নানা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হয়, তবেই আমাদের স্বপ্ন সার্থক হইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার নিকট হইতে এদিক দিয়া কোন সাহায্য লাভের লক্ষণ খুবই কম। মিঃ আমেরি ও মিঃ চার্চ্চিল ভারত সাম্রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র-পরিচালক জমিদারী মনে করেন এবং সেই জমিদারী হাতছাড়া করিয়া তাঁহারা কলঙ্কের ভাগী হইতে ইচ্ছুক নন। এই মনোভাবের জন্যই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আটল্যানটিক চার্টারের প্রয়োগ ভারতবর্ষের উপর হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিতে লজ্জা পান নাই।

* India has a stake in victory. The proper approach to this question is this : India has made certain contributions to the war efforts of the United Nations. If these efforts result in victory then India will have certain claims to make on the post-war world on the basis of her contribution to victory. Nothing that India can do can put her claim on a higher level than that.

ভারত সরকারের অর্থসচিবের বক্তৃতা

৯ই মার্চ্চ, ১৯৪৩।

অবশ্য শ্বেতস্বার্থ সংরক্ষণের মোহ বিসর্জ্জন দিয়া ব্রিটিশ সরকার যে ভারতের মুখের পানে চাহিয়া এদেশ শাসন করিবেন,—ইহা সম্পূর্ণ আশাবাদের কথা। যুদ্ধের ষষ্ঠ বৎসর এখন চলিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত ভারতের জননেতারা এ যুদ্ধের কোন অংশ গ্রহণের অধিকার পাইতেছেন না। তবে বিলাতী স্টার্লিংয়ের বদলে বিলাতী দেনা শোধে সুদের আট কোটি টাকা বাঁচায়, কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক বিদ্রোহদমনের মত সমরোপকরণের স্থানে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের প্রভূত সংস্থান হওয়ায় এবং লোকের জীবনমান অনিবার্য্য প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ বাড়িয়া যাওয়ায় আমরা উন্নততর ভবিষ্যৎ আশা করিতেছি। ভারত সরকার ভারতীয় শিল্প প্রসার কোনদিনই ভাল নজরে দেখেন নাই; এবার প্রয়োজনের তাগিদে যে সকল শিল্প ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হইয়াছে তাহা ভারতের দরকারের তুলনায় সামান্য হইতে পারে, কিন্তু শিল্প-বিপ্লব জাগাইবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে এগুলিরও মূল্য যথেষ্ট। যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা এই যুদ্ধের মধ্যে যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের উন্নতিও ঘটিয়াছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। এলুমিনিয়াম, সিগারেট, ব্লিচিং পাউডার, কাচশিল্প, প্লাইউড শিল্প, নানাপ্রকার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থাদি প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি এবারের যুদ্ধে ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া গেল। বিড়লা কোম্পানীর পাওয়ার এ্যালকোহলের কারখানা চালু হইলে এই গতির যুগে ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহ লাভবান হইবে। বস্ত্রশিল্প, সিমেণ্ট ও কাগজ-শিল্প হয়তো যন্ত্রপাতির অভাবে আয়তনে বাড়িতে পারে নাই, কিন্তু উৎপাদনের দিক দিয়া তাহারা আশ্চর্য্য রকম সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মাত্র ৬০ হাজার টন আন্দাজ কাগজ প্রস্তুত হইত, বাকী প্রায় দেড়লক্ষ টন কাগজ আসিত বিদেশ হইতে। যুদ্ধের

সময় বিদেশের কাগজ আসা একদিকে যেমন বন্ধ হইয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি এদেশে কাগজের প্রয়োজন বাড়িয়া গেল বহু পরিমাণে। সরকারী ও বেসরকারী চাহিদা মিটাইতে ভারতের ১৭টি মিলে যথাসাধ্য উৎপাদন বাড়াইবার ফলে ১৯৪৩ সালে ১ লক্ষ ৯ হাজার টন কাগজ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। বিদেশী আমদানীর অভাবে ভারতীয় ঔষধপত্র ও প্রসাধন-দ্রব্যগুলিও জনসাধারণের পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাছাড়া বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও বিড়লার মোটরগাড়ীর কারখানাকে ভারতের যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রথম প্রতীকরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। মিঃ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ৫০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া যে মোটরগাড়ী ও বিমানের কারখানা খোলার সংকল্প করিয়াছেন, তাহাও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টাটার প্রস্তাবিত রেল ইঞ্জিনের কারখানা দেশের একটি বিরাট প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রসংখ্যা প্রসারিত হওয়ায় দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির অবশ্যই কিছু কিছু সুবিধা হইবে। যে সব শিল্পপতি বর্ত্তমানে এদেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপক আয়োজন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই চাহিতেছেন যুদ্ধের সুযোগটুকুর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে। ভারতবর্ষের মত বিপুলায়তন দেশের পক্ষে উল্লিখিত প্রচেষ্টা যথেষ্ট বলা যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু এই সকল শিল্পপতির সমবেত প্রয়াস পথ দেখাইয়া দিলে এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে জনসাধারণকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলে ভারতে আশানুরূপ শিল্পপ্রসার অপেক্ষাকৃত সহজে সম্ভব হইবে।

আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত অনেক শিল্প সামান্য পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে, তাহাদের পক্ষে সরকারী চাহিদা মিটানো লাভজনক সন্দেহ নাই;

কিন্তু সেই লাভের লোভে তাহারা এখন জনসাধারণের কাছে নিজেদের উৎপণ্য দ্রব্যসমূহ পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে না। ইহার ফলে যুদ্ধের পরে বহুপরিচিত এবং বহুপ্রচারিত বিদেশী মাল যখন বন্যার মত ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিবে তখন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে দেশী জিনিস কিনিবার ইচ্ছা থাকিলেও এদেশবাসী তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পারিবে না। ভারত সরকার এ বিষয়ে এখনো এত অনুদার ও নির্ব্বাক যে তাহাদের ভবিষ্যতের সহিত সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ জড়াইয়া থাকিবার কথা নবগঠিত শিল্পের মালিকদিগকে বুঝাইবার কোন চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন না। বড় বড় অনেক শিল্পপতি ও ধনী ব্যক্তি এদেশে বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সংকল্প সমর্থনে অনিচ্ছার ভাবই প্রকাশ করিতেছেন। All India Manufacturers' Association-এর চতুর্থ বার্ষিক সভায় স্যার বিশ্বেশ্বরাও ভারত সরকারের ভারতে শিল্প বিস্তার সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। যুদ্ধের সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারত সরকার নিজেদের অপ্রস্তুত থাকিবার ত্রুটি স্বীকার করিয়া এবং এই ত্রুটির লজ্জাকর সুবিধা লইয়া অন্য সব কিছু অস্বীকার করেন। যুদ্ধের প্রথম হইতেই ভারতের চরম বিপদের দিনে তাহার সমগ্র ধনজন শক্রর অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত বলিয়া জোর প্রচার চলিয়াছিল এবং যুদ্ধের সুযোগে শিল্প প্রসার ও প্রতিষ্ঠার প্রচুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে যাঁহারা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, নানাভাবে তাঁহাদের থামাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যন্ত্রপাতির শোচনীয় অভাবে এদেশে শিল্পোন্নতি একেই প্রায় অসম্ভব, তাহার উপর সামরিক প্রয়োজনের নামে ভারত সরকার ধাতুসমূহ নিয়ন্ত্রণ

করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া তামা, লৌহ, ষ্টীল, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় উৎসাহী জনসাধারণও মালপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসায়ে নামিবার সাহস হারান। গৃহস্থের প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ পিতল মাঝে বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সম্প্রতি বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে বেসরকারী প্রয়োজনীয় বাসনপত্র যাঁহারা তৈয়ারী করেন তাঁহারা যেন ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কাছে খোঁজ নেন, ভারত সরকার কিছু পরিমাণ এ্যালুমিনিয়াম বাজারে ছাড়িবেন। সরকারী এই নিয়ন্ত্রণ-নীতির জন্য ভারতের শিল্পাগারগুলির উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে এবং চাহিদার সামান্য অংশ মাত্র যোগান দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হওয়ায় জিনিসের দাম বাড়িতে বাড়িতে মূল্যহার সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে যদিও পণ্যমূল্যের এই রেখা সর্ব্বোচ্চ হইয়াছিল, ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে সাধারণ ব্যবহার্য্য পণ্যের মূল্যহার ২৩৫.২ বলিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব সরকারীভাবে স্বীকার করিয়াছেন। অবস্থা আয়ত্তে আনার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার ভারতবাসীর স্বাবলম্বী হইবার স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। মহাযুদ্ধের আমলে সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য সব দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ কম লাভবান হইয়াছে, চল্লিশ কোটি নরনারী অধ্যুষিত দেশে সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ শিল্প প্রসার সম্ভব হইয়াছে, নানা বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া; কিন্তু এই সামান্য আলোকরশ্মিটুকুও ব্রিটিশ সরকার সহিতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ডের একখানি সরকারী ইস্তাহারে লেখা হইয়াছে—The intensive development and diversification of Indian

Industries now occurring is expected to reduce United Kingdom post-war export to still lower level. ইংরাজ রাজশক্তির এই জমিদারী মনোবৃত্তির কোন অর্থ হয় না, ভারতের শিল্পোন্নোতিতে তাঁহারা বাজার বেহাত হইবার ভয় করেন, অথচ আমেরিকা যে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণ মাল এদেশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে, সে বিষয়ে বাধা দিবার কোন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না কেন ? সত্য কথা বলিতে গেলে আমেরিকা যে পথ বাছিয়া লইয়াছে, ভারতের বাজার দখলের পক্ষে সেই পথ ইংলণ্ডের অবলম্বিত পথের চেয়ে ঢের ভাল। ব্রিটিশ সরকার ভারতের জীবন-মান বাড়াইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই, দেশজোড়া দারিদ্র্যকে তাঁহারা নিজেদের প্রভুত্ব ও বাণিজ্যের পক্ষে শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। আমেরিকা প্রথম হইতেই চাহিতেছে ভারতের জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি, যাহার ফলে জীবন-যাপনের প্রণালী উন্নততর হইলে তাহারা সহজেই আরামের জন্য দু'পয়সা ব্যয় করিতে পারিবে। মাথা পিছু বৎসরে যদি ১০ টাকা আয় বৃদ্ধি হয় (সেটা করা সম্ভব দেশে শিল্প বিস্তৃতি ও কর্ম্মপ্রবণতা সৃষ্টি করিয়া) তাহা হইলেই বাড়তি ৪০০কোটি টাকার বিরাট বাজার এই ভারতবর্ষেই গড়িয়া উঠিবে। দেশীয় শিল্প-পণ্য যতই ব্যবহৃত হউক, এই বর্দ্ধিত আয় এখনই সেই বাজার সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিতে পারিবে না ; সুতরাং বিদেশী পণ্যের ব্যবহার এদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ঘাত বাড়িয়া যাইবে।

চারিদিকের হাওয়া দেখিয়া মনে হয় যুদ্ধ এখন শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লোভের সমারোহে প্রথম দিকে মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যাইবারও প্রেরণা ছিল সত্য, কিন্তু সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে অগণিত প্রাণ ও অসীম সম্পদ ধ্বংস করিয়া যে মহাযুদ্ধ ইতিহাস সৃষ্টি করিল, তাহার সমাপ্তি

আজ প্রায় সকলেই চাহিতেছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধের মধ্যে কিছু করিতে পারে নাই, যুদ্ধের শেষ অবস্থায় আজ তাহারও শেষ সুযোগ আসিয়াছে। অর্থ নৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে বিংশ শতাব্দীর গতিশীল জগতে বাঁচিয়া থাকার কোনো মূল্য নাই। ভারতের মাথাপিছু আয় বেশী-পক্ষে ৭৮ টাকা হইলেও ধনী দরিদ্রের অংশ হিসাব করিলে দেখা যাইবে শতকরা ৯০ জন লোকের ভাগে ইহার অর্দ্ধেকও পড়ে না। মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়া জীবনের সাধনা করার দিন আসিয়াছে, আজ দুচোখ মেলিয়া পথ চলিলে হয়তো আমাদের গতি হইতে পারে, না হইলে সবার পিছে এবং নীচে পড়িয়া থাকিবার আত্মগ্লানিতে এ শতকের মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না। যাঁহারা ভারতবর্ষ শাসন করেন, আমাদের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব তাঁহাদের, কিন্তু নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্বার্থের চাপে আমাদের জন্য মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। যুদ্ধান্তে আমাদের আশা সার্থক করিয়া যদি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্ভবও হয়, আজ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলে সেদিন বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠানকেই ঠেকান যাইবে না এবং আমাদের পক্ষে তখন নূতন শিল্প গড়িয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া এক-রূপ অসম্ভব হইবে। আর যদি সাম্রাজ্যবাদী বর্ত্তমান নীতিই ব্রিটিশ সরকার আঁকড়াইয়া থাকেন, এখন হইতে কিছু ব্যবস্থা না করিয়া লইলে সেদিন আমরা আরও অসহায় হইয়া পড়িব। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে আমাদের জন্য কেহই কথা বলে নাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষেও আমাদের বাঁচাইতে কাহারও দেখা পাওয়া যাইবে না। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময় আমেরিকান সৈন্যেরা দর্শক হিসাবে মহা-নগরীর পথে পথে ঘুরিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন

দমন করিবার যে কোন অধিকার ইংরাজের আছে বলিয়া আমেরিকা স্বীকার করিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যে ভারতবর্ষের ব্যাপার ইংরাজদের ঘরোয়া ব্যাপার। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হইলে আমেরিকার পক্ষে ভারতবর্ষে স্বার্থ সংস্থানের চেষ্টা করা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে যাই করুক ব্রিটেনের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়াই করিবে, ভারতের কল্যাণের জন্য ব্রিটেনের সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করিয়া নয়। যুদ্ধের পর বিলাতে জমা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পর্ব্বতপ্রমাণ স্টার্লিংয়ের পূরো টাকা মূল্যহারের দৌরাত্ম্যে হয়তো আমরা পাইব না, সবচেয়ে ভাল হইত যদি ঐ টাকায় এখন হইতেই ভারতের বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ভারত সরকার কিনিয়া লইতেন এবং পরে ভারতীয়দের নিকট ওইগুলি বিক্রয় করিতেন। এ ছাড়া ঐ টাকায় বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনিয়া শিল্প প্রসারের সুবিধা করিয়া লইলে ভারতের স্থায়ী উপকার হইতে পারিত। কল্পনাপ্রবণ হইয়া বস্তুতান্ত্রিক জগতে লাভ নাই সত্য, কিন্তু ভারতসরকারের সামান্য দূরদৃষ্টি ও সহৃদয়তার বিনিময়ে ভারতের যে বিরাট্ ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা এভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ায় যে কোন সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসী ব্যথাতুর না হইয়া পারে না।

যুদ্ধের শেষ অবস্থায় যুদ্ধের পরে কেমন করিয়া অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদ পুনর্গঠন করা যাইবে সে সম্বন্ধে অনেকে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই অপর্য্যাপ্ত কাঁচামাল ও অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ব্রিটেন প্রভৃতি মধ্য-ইউরোপের দেশগুলি বিদেশের সম্পত্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধের খরচ যোগাইতে বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে, অথচ খাদ্য ও কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর তাহাদের নির্ভর না করিলে চলে না। ইংলণ্ডের একমাত্র ভরসা

তাহার শিল্প-প্রতিভা। যদি কাঁচামালের যোগান ঠিকমত হয় এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার মত লাভজনক বাজার পাওয়া যায়, তবেই ইংলণ্ডের পক্ষে বাঁচা সম্ভব। আমেরিকা দৈত্যের মত পণ্যোৎপাদন বাড়াইয়া ফেলিয়া আজ বৈদেশিক বাণিজ্যে ইংলণ্ডের শক্তিমান প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। ভাল করিয়া আটলান্টিক চার্টারের অর্থনৈতিক ধারাগুলি পড়িলে মনে হয়—চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি জনবহুল কৃষিপ্রধান দেশের কাঁচামাল ও বাজারের সুবিধা গ্রহণই শিল্পপ্রধান আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আসল লক্ষ্য। একে তো যুদ্ধের সুযোগে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সুবিধায় সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর অষ্ট্রেলিয়ার ৬৫ লক্ষ, কানাডার এক কোটি ও সাউথ আফ্রিকার মাত্র ৮০ লক্ষ লোক নিজেদের দেশের পণ্য ছাড়া বাহিরের পণ্য কতটুকুই বা ব্যবহার করিতে পারে? ঘরের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার বাজার আমেরিকার পক্ষেই দখল করা সম্ভব; কাজেই ইংলণ্ডের একমাত্র আশা ভারতবর্ষ ও চীন। ভারতের প্রয়োজন অনেক, লোকসংখ্যা নিত্যই বাড়িতেছে, শিল্প যতই উন্নতি সাধন করিয়া থাকুক, গত দশ বৎসরের লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার পর তাহার উৎপাদন-ক্ষমতায় কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কি না সন্দেহ। তাছাড়া এই দুই দেশে তাহাদের কায়েমী প্রতিষ্ঠাও উপেক্ষার বস্তু নয়।

কথা দিয়াও শক্তিমান প্রতিজ্ঞাকারী কথা রাখে নাই, আমাদের মত অসহায় জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। পরিকল্পনা যত উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই রচনা করা হউক, পৃথিবীর সমস্ত দুর্ব্বল দেশের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদের প্রাণধারণের মত সংস্থান সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একটি

শক্তিশালী সর্ব্বজাতীয় প্রতিষ্ঠান যদি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে, তাহা হইলে মাতব্বরী করিবার অধিকার যে সকল জাতির হাতে থাকিবে, তাহাদের স্বার্থপরতার চাপে শক্তিহীন জাতিগুলির দুর্দ্দশার আর অন্ত থাকিবে না। উপনিবেশের দাবীতে অন্য দেশের ধনজন ক্ষয় না করিয়া যদি কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির অনুমোদনক্রমে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী জাপান প্রভৃতি জনবহুল ক্ষুদ্র দেশের বাড়তি লোকগুলি সাউথ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি জনহীন দেশে বাসা বাঁধে, তাহা হইলে সেই সব দেশের উপর হইতে অর্থনৈতিক চাপ অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের পক্ষে আটল্যাণ্টিক চার্টারের রাজনৈতিক ধারাগুলি যদি প্রযোজ্য হয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের উপর হইতে ইংরাজ তাহার দাবী ত্যাগ করে, তাহা হইলে অবশ্য বিশ্বব্যাপী সৌহার্দ্দ্যের সূত্রে ভারতের পক্ষে অন্যদেশকে বাণিজ্যিক সুবিধা ও প্রাকৃতিক সম্পদের একাংশ দিতে বিশেষ আপত্তি হইবে না; কিন্তু যদি রাজনৈতিক অবস্থা এখনকার মতই হতাশাজনক থাকে তাহা হইলে আটলাণ্টিক চার্টারের অর্থনৈতিক ধারাগুলি জোর করিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চূর্ণ করিয়া দেওয়া এবং চিরকাল অন্যান্য জাতির শোষণের চাপে ভারতকে থাকিতে বাধ্য করা শুধু কুনীতি নয়, রীতিমত অপরাধ হইবে।

যুদ্ধোত্তর জগতের রূপ কি হইবে তাহা লইয়া এখন হইতে জগদ্ব্যাপী জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। অন্যান্য দেশের আর্থিক বনিয়াদ অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজেই তাহাদের পক্ষে পরিকল্পনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। একে ভারতের সমস্যা বহুমুখী, তাহার উপর ভারতবাসীর জীবনমান অত্যন্ত নীচে বলিয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যুদ্ধজনিত বাড়তি আয় যখন কমিয়া যাইবে, তখন জিনিসপত্রের দাম সঙ্গে সঙ্গে কমিবে না বলিয়া

ভারতবাসীর পক্ষে বাঁচাই সেদিন দুর্ঘট। আজ মুদ্রানীতির অব্যবস্থায় যে ভয়াবহ সম্প্রসারণ দেখা দিয়াছে তাহার ফল আমাদের পক্ষে অশুভ হইবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। * গত যুদ্ধের পর মুদ্রাস্ফীতির জন্য ইংলণ্ডে ২০ লক্ষ সুস্থ সবল শ্রমিক দীর্ঘস্থায়ী বেকারজীবন যাপনে বাধ্য হইয়াছিল; জার্ম্মানীর অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আগে প্রায় তের আনা যে মার্কের মূল্য ছিল, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সেইরূপ বিশ হাজার মার্ক দিয়া এক কাপ চা পর্য্যন্ত জার্ম্মানীবাসীকে কিনিয়া খাইতে হইয়াছে! ভারতবর্ষের জীর্ণ আর্থিক বনিয়াদের কথা আজ সকলেই জানেন, এখন হইতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিলে হয়তো আমরা অনাগত দুর্দ্দশার ভয়াবহতা কিছু পরিমাণ কমাইতে পারি।

উপস্থিত আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে আমেরিকা। আমেরিকা ভারতে সৈন্য পাঠাইয়াছে, অস্ত্র পাঠাইয়াছে, জলের মত অর্থব্যয় করিতেছে,—এ সকল অবশ্যই ভারতের বা ইংরাজের স্বার্থের জন্য নয়। পৃথিবীর বর্ত্তমান শক্তিগুলির মধ্যে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার সম্বন্ধে আমেরিকা যেরূপ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, এমন আত্মোপলব্ধি আজ আর কাহারও নাই। ব্রিটেনের সহিত ফ্রান্সের যখন নানাদিক হইতে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তখন ব্রিটেনের চেয়ে বহির্ব্বাণিজ্যে এবং ফ্রান্সের চেয়ে স্বর্ণসম্পদে বড় হওয়া ছিল তাহার সাধনা। ফ্রান্সের অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্র বহুগুণ বৃহৎ

* What is still more dangerous is that inflation will inevitably be followed by an equally drastic process of deflation and the whole cycle of misery, privation and injustice will be reversed.

Azaz, S. Peerbhoy: Inflation in India. P. 36.

স্বর্ণভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াছে, যুদ্ধের পরে তাহার বর্দ্ধিত প্রভাবে সে ইংলণ্ডের চেয়ে বড় বাণিজ্যক্ষেত্র দখল করিয়া লইবেই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জগতের উপর প্রভুত্ব আমেরিকা আগেও সহিতে পারে নাই। ১৯১৯-২০ সালে আমেরিকার পেট্রোলিয়াম যখন নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যপ্রাচ্যে একচেটিয়া পেট্রোল অধিকার লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের মনোমালিন্য হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার দাবী স্বীকার করিয়া ইংরাজ ফরাসী মালিকেরা মসুলের বিখ্যাত পেট্রোল খনির উত্তোলিত পেট্রোলিয়ামের ¼ অংশ আমেরিকাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতে আমেরিকা ঋণ ও ইজারা বিলের দরুণ যে বিরাট পরিমাণ পণ্য পাঠাইতেছে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ সমরসম্ভার। শিল্পজাত এইসব বস্তুর মূল্য এই যুদ্ধের বাজারে বেশী হওয়াই সম্ভব অথচ যুদ্ধের পরে শোধ দিবার সময় টাকায় দিবার সামর্থ্য যখন আমাদের নাই এবং জিনিস দিয়া জিনিসের দাম দিবার ব্যবস্থা যখন এই ঋণ ও ইজারা আইনে রহিয়াছে, তখন শিল্পে অনুন্নত এই দেশকে বাধ্য হইয়া কৃষিপণ্য দিয়া দেনা শোধ করিতে হইবে। ভারতের শস্য উৎপাদন তাহার সমগ্র অধিবাসীর পক্ষে যথেষ্ট নয়, শতকরা প্রায় ২½ ভাগ খাদ্যশস্য বাহির হইতে আনিতে হয়, ইহার উপর যদি আমেরিকায় শস্যরপ্তানী চলে, আমাদের পরমুখাপেক্ষিতাজনিত অসুবিধার সীমা থাকিবে না। সেদিন আমাদের অসহায় অবস্থা আমেরিকাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে বহু সাহায্য করিবে। যুদ্ধের সুযোগে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার নামে আমেরিকা ভারতের বাজারটি গ্রাস করিবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়াছে। একদিকে স্বর্ণ তহবিলের উপর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রামান পৃথিবীতে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া যুক্তরাষ্ট্র চায় নিজেদের বিরাট

স্বর্ণসম্পদের আর্থিক মূল্য সৃষ্টি করিতে এবং তাহারই মহিমায় পৃথিবীর সব দেশের উপর অর্থসাচ্ছল্যের সুবিধা লইতে, অন্যদিকে ঘরের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান বাজার ছাড়াও শিল্পে অত্যন্ত অনুন্নত কৃষিপ্রধান চীন ও ভারতের বিপুলায়তন বাজার দখল করিয়া নিজেদের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়। বুদ্ধির খেলায় আমেরিকার নিকট ইংলণ্ড যে এবার পরাজিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে এই পরাজয়ের ফল যে আরও সুদূরপ্রসারী হইবে, ইহা প্রশ্নাতীত সত্য। এ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া জনৈক ভারতীয় অর্থনীতিবিদ যথার্থই বলিয়াছেন:—The yankee has not proved himself to be less shrewd a bargainer than tbe John Bull. (K. T. Shah. *How India pays for the war.* p. 55).

ভারতের জন্য যুদ্ধোত্তর যে কোন পরিকল্পনাই করা হউক তাহাতে সব চেয়ে বড় করিয়া কৃষি ও শিল্পের দিক দেখিতে হইবে। কৃষি এদেশের প্রধান উপজীবিকা, শতকরা ৬৭·২ ভাগ লোক কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে এবং শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত বলিয়া শিল্পে নিয়োজিত লোকসংখ্যা মাত্র শতকরা ১০·২ ভাগ। শুধু শিল্পোন্নতি করিয়া জার্ম্মানী ও ইংলণ্ড বড হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবন যে ভাবে গডিয়া উঠিয়াছে তাহাতে কৃষিকে বাদ দিলে বা অবহেলা করিলে ভারতবাসীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব নহে। কৃষির সহিত সারা দেশের এমনি নিবিড় সম্পর্ক আছে যে, কৃষিকর্ম্মের উন্নতিবিধানের দ্বারা শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধি বা পরিমাণবৃদ্ধিতে কৃষকের আয় বাড়াইতে পারিলে তবেই এখানকার সকল লোক অন্নের সচ্ছলতা লাভ করিতে পারিবে। বৎসরে অর্দ্ধ-কোটি করিয়া লোক বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উপর চাপও বাড়িতেছে যথেষ্ট পরিমাণে।

অনেকে বলেন ভারতে যে ১১ কোটি একর অজন্মা জমি ও ৫ কোটি একর পতিত জমি আছে, সুবিধামত তাহাতে চাষ করিতে পারিলে এবং কৃষিকর্ম্মে সমবায়ের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক রীতি চালাইতে পারিলে কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হইতে পারে। বাংলায় প্রচলিত ঋণ-সালিশী বোর্ড ও ভবনগর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদায়িত্বে জনসাধারণের অবস্থানুযায়ী সহযোগিতার ভিত্তিতে কৃষিঋণ পরিশোধ পরিকল্পনা, এই দুটি ব্যবস্থা একত্রে কাজ করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী হস্তক্ষেপে কৃষিজাত পণ্যের দর বাঁধিয়া দিলে ভারতীয় কৃষক ঋণের গুরুভার হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইবে। তাছাড়া বর্ত্তমান যুদ্ধে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে কৃষকগণের ঋণ কিছু পরিমাণে পরিশোধ হইয়াছে। চাষের জমির খাজনার হার কমান ও কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার ব্যাপক ব্যবস্থা করাও কৃষির উন্নতিবিধানের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য।

এই কৃষকদের মুখ চাহিয়াই ভারতে শিল্প-প্রসারের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাইতেছে। বৎসরে ৫০ লক্ষ লোক যে-দেশে বাড়ে এবং কৃষির স্বাভাবিক নিয়মে যেখানে জমির উৎপাদন-শক্তি দিনের পর দিন কমিয়া যায়, সেখানে শিল্পপ্রসার দ্বারা কৃষি-জনতার একাংশকে শিল্পে নিয়োগ না করিলে কৃষি-প্রধান এই দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করা একেবারেই অসম্ভব। আগে কুটীর-শিল্প কৃষকদের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করিত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় এবং সরকারী অব্যবস্থা ও পণ্য-ব্যবহারকারী জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবে সে শিল্প আজ প্রায় লোপ পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের শ্বেত-স্বার্থ রক্ষার মোহ যে দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই ফলে ১৯১৮ সালের ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনের অনুমোদনগুলি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়া হইতে আজ পর্য্যন্ত

ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কোন ব্যাপক উন্নতি দেখা যায় নাই। অবশ্য ভারতের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক শিল্পপ্রসারের নামে কৃষিকে অবহেলা করিবার যে আবহাওয়া এদেশে সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও আমাদের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কোন উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইলে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। শিল্পপ্রসারের প্রয়োজন এদেশে যথেষ্ট, কিন্তু সেই প্রয়োজনের তাগিদে কৃষির উন্নতি করাও যে দরকার এ কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। এদেশে কৃষিজীবনের সমৃদ্ধি সম্পাদনের সহিত ব্যাপক শিল্পপ্রসার না হইলে কোন উপায় নাই এবং বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিব্যবস্থা এখানে চালু হইলে বেকার কৃষিশ্রমিকদের প্রসারিত শিল্পে পুনর্নিয়োগ যদি সম্ভব হয় তবেই ভারতের আর্থিক জীবন সচ্ছল হইয়া উঠিতে পারে। এই যুদ্ধে ভারতের প্রভূত সুযোগ ছিল, কিন্তু কতকটা সমরোপকরণ উৎপাদন ব্যাহত হইবার ভয়ে এবং কতকটা চিন্তাশীলতার অভাবে দেশবাসীর আগ্রহসত্ত্বেও সে সুযোগ গৃহীত হইতে পারে নাই। যদিও ইংরেজদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, জন-কোম্পানীর প্রথম যুগের দুর্নীতির জন্যই ভারতবর্ষে তাহাদের নামে শোষণের বদনাম, না হইলে ভারতের স্বার্থে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়ার ইতিহাস আছে, তবু বস্তুতান্ত্রিক বর্ত্তমান জগতের আসরে ভারতকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের দান অস্বীকার না করিয়াও একথা বলা যায় যে, অতীত ভারতের কুটীরশিল্প নষ্ট হইতে দিয়া ভারতকে ইংরেজ যতখানি পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে, সে অনুপাতে বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য তাহারা বিশেষ কিছুই করে নাই। * শিল্প প্রসারের চেষ্টা

---

* আমেরিকান লেখিকা **Miss Kate Mitchell** এই সম্পর্কে বলিয়াছেন :—

করিলে চল্লিশ কোটি লোকের দেশে শ্রমিকের অভাব হইত না, অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদও শিল্পে ব্যবহার করা যাইত। জাপান ইউরোপের আদর্শে ৫০ বৎসরের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রধান দেশ রূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিল, অথচ আমাদের সহিত তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। জাপান জাপানীত্ব বজায় রাখিয়া ইউরোপীয় ভাবধারার সুবিধাটুকুই গ্রহণ করিয়াছে, আমরা নিজেদের জাতীয়তা ভুলিয়া ছিলাম বলিয়া ইউরোপের জাতিসমূহ আমাদের দুর্ব্বলতার চরম সুযোগ লইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকিলে আমরা বিদেশ হইতে টাকা ধার করিয়াও শিল্পপ্রসার করিতে পারিতাম। গঙ্গার জলে ঢালিবার মত অজস্র টাকা শতকরা পাঁচ টাকা সুদে বিলাত হইতে কর্জ্জস্বরূপ আনিয়া আমরা রেলপথ তৈয়ারী করিয়াছি ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য বাহিরের হাতে তুলিয়া দিয়া সর্ব্বমুখী রিক্ততা বরণ করিতে, কিন্তু সেই রেলপথ আমাদের পক্ষে কল্যাণদায়ক করিয়া তুলিতে আরও কিছু বেশী টাকা আনিয়া দেশে কলকারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করি নাই।

আশার কথা, বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের মত নির্জ্জীব পরমাত্মা-সন্ধানী জাতির প্রাণেও বাঁচিবার প্রেরণা আনিয়াছে। এই অন্তিম সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের একান্ত উচিত এ সময়ে যতটুকু সম্ভব আর্থিক উন্নতি সাধন করা। শিল্প ছাড়া যখন ভারতীয় কৃষি বাঁচিতে পারে না, তখন কৃষির সম্ভাব্য উন্নতিবিধানের সহিত শিল্পপ্রসারের ব্যাপক

No one can deny the vital and constructive role played by Britain in laying the foundation for Indian material progress in the modern world, but the fact remains that the British did not complete their work. They destroyed the foundation of the old self-sufficient economy, but were unwilling to construct a new one.

ব্যবস্থা করিয়া ভারতকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এখন বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মাথা গলানোতে ভারত-সরকারের ভারতীয় শিল্প-প্রসার সম্বন্ধে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার কোন মূল্য নাই এবং তাঁহারা ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার মোহে যাহা করিতেন, আমেরিকার জন্য সে হীনতা অবলম্বন করার কোন অর্থ হয় না।

স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, বিড়লা, টাটা প্রভৃতি বোম্বাইয়ের আট জন শিল্পপতি যুদ্ধোত্তর ভারতের আর্থিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে শিল্প কৃষির চেয়ে বড় স্থান পাইয়াছে এবং কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কৃষির আয় প্রায় স্থির, কিন্তু শিল্পের আয় প্রসার- ও পরিচালনা-যোগ্যতার দ্বারা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাঁহাদের এ পরিকল্পনা যদি কার্য্যকরী হয়, শিল্প-শ্রমিকদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য কৃষিশ্রমিকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করিবে এবং তাহাতে কৃষিব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সচ্ছলতা সৃষ্টি করিতে না পারিলে ভারতীয় কৃষির আহত হইবারই সম্ভাবনা। অবশ্য Indian Federation of Labour (মিঃ এম এন রায় যাহার সাধারণ সম্পাদক) 'People's Plan' নামে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে কৃষির উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং শিল্পজাগরণের দিনে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের এই কৃষি-কেন্দ্রিক পরিকল্পনাও দেশের নবজাগ্রত শিল্প-প্রতিষ্ঠার উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করিয়া দিবে। কৃষির বর্ত্তমান উৎপাদন নানা উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা তাঁহারা চারগুণ বৃদ্ধির আশা রাখেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় কৃষির স্থান কতখানি তাহা নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই বুঝা যাইবে :—"An attempt to increase the purchasing power of the People will have to start by concentrating

on agriculture which affords the main channel of employment to a majority of People. Agriculture thus constitutes the proper foundation of a planned economy for the country".

কিন্তু দেশের সত্যকার উন্নতি সাধন করিতে হইলে একই সঙ্গে কৃষির উন্নতি ও শিল্পের প্রসার করার প্রয়োজন। শিল্প না বাড়িলে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনতার চাপ কমান যাইবে না এবং কৃষির উপর অতিনির্ভরশীলতা কমাইতে না পারিলে নূতন প্রণালীতে ব্যাপকভাবে চাষ করিবার দায়িত্ব লওয়াও কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পরিচালনাধীনে যে জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহারা প্রথম হইতেই শিল্প ও কৃষি—এই দুই বিভাগেই পুনর্গঠন-ব্যবস্থা শুরু করিবার বিধান দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যে সকল শিল্পের অভাবে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় সেগুলির পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত এবং যে কোন নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পূর্ণমাত্রায় থাকিলে ভাল হয়। বর্ত্তমানে মাত্র দুইশত আন্দাজ শিল্পপতি ভারতের সমগ্র শিল্প-প্রচেষ্টার শতকরা ৮০ ভাগ পরিচালনা করিতেছেন, বাকী কুড়ি ভাগের উপরও তাঁহাদের প্রভাব আছে যথেষ্ট পরিমাণ। এইরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করান কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সুবিবেচনার পরিচয় নয়। তাঁহাদের পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি যেমন পাঁচ বৎসরে পরিশোধিতব্য জনসাধারণের প্রদত্ত ঋণে সম্ভব হইবে, শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি অন্যান্য ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে কেন্দ্রীয় জাতীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। সাধারণের উৎসাহ ও সাচ্ছল্য সৃষ্টিতে লাভের পথ খুলিয়া

গেলে ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ আদর্শবাদের উপর স্থাপিত People's Plan-এ কোন শিল্পেই ব্যক্তিগত মুনাফা ভোগ চলিবে না। প্রথম হইতে জনসাধারণ মাত্র ৩ টাকা সুদে ঋণ দিবেন এবং শিল্প চলিবে রাষ্ট্রের পরিচালনায়। ভোগ্যবস্তু (Consumers' goods) উৎপাদনে জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতি যেটুকু ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, People's Plan-এ তাহাও স্বীকৃত হয় নাই। বোম্বাই পরিকল্পনায় শিল্পে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের আভাস আছে সত্য, কিন্তু সেখানে শিল্পপ্রগতিতে ধনিকশ্রেণীর অধিকার রাষ্ট্র কাড়িয়া লইতে পারিবে না। বণ্টন সম্বন্ধে এই পরিকল্পনা আপাতত নির্ব্বাক বলিয়া শিল্পপ্রগতিতে লক্ষপতির যেমন কোটিপতি হইবার সম্ভাবনা আছে সেই অনুপাতে বাৎসরিক মাথাপিছু ৬৫ হইতে ৭৪ টাকায় আয়বৃদ্ধির কথাটা শেষ অবধি হিসাবের ধোঁয়া হইয়া যাইতে পারে। তবে আমরা আশা করি যে, স্যার পুরুষোত্তমদাসের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহাতে এত বড় ফাঁকি ও ফাঁক হয়তো থাকিবে না। বোম্বাই পরিকল্পনার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, সেইখণ্ডে বণ্টন নীতি ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা থাকিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির পরিকল্পনায় বণ্টন-সমস্যাকে ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাঁহারা সকলের স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির সহিত বণ্টনব্যবস্থার সমতারক্ষা করিতে চাহিয়াছেন।*

---

* Distribution is the vital corner-stone of any planned economy and evils of industrialisation can and should be avoided if there is any equitable system of distribution. In the National Plan for India, a proper scheme of distribution must, therefore, be considered as essential.

১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী যে সকল ভারতবাসী শিল্পপ্রসারের পর কৃষি বা বেকার জীবন ছাড়িয়া শিল্পে যোগ দিবে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত তাহাদের মানসিক নিঃস্বতা সৃষ্টি না করিয়া তাহাদের স্বার্থরক্ষার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। শোষণ না করিয়া তাহাদের জীবন-মান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা শ্রমিকদের স্বার্থ, বেতন, শ্রমের সময়, কারখানা ও আবহাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। এই প্রস্তাবানুসারে মালিক এবং শ্রমিকদের মতদ্বৈধ মিটাইবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে নিয়োজিত থাকিবেন এবং শ্রমিকেরা বৃদ্ধ বয়সে, অসুখে বা বেকার থাকার সময় যাহাতে সাহায্য পায়, তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে। স্ত্রী-শ্রমিকদের রক্ষা করিবার এবং প্রসবকালে ছুটি দিবার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজনীয়তাও এই প্রস্তাবে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, যে সকল ছেলের ইস্কুলে যাইবার বয়স, তাহাদের কোন অজুহাতেই খনির কাজে শ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করা হইবে না; কৃষক এবং শিল্পশ্রমিকেরা সমিতি গড়িয়া তাহাদের স্বার্থের বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইতে পারিবে।

National Planning Committee-র পরিকল্পনায় ও People's Plan-এ বিশেষভাবে এই কথাটিই বলা হইয়াছে যে, ভারতের সুনাম ও সম্ভ্রম বাড়ুক বা না-ই বাড়ুক, জন-সাধারণের বাঁচিবার সঙ্গতি না হইলে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উন্নতিই মিথ্যা হইয়া যাইবে। ভারতের জনসাধারণ যদি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগাধিকার আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া

Handbook for the guidance of Sub-Committees. I. P. 79.

সার্থক হইতে পারে, তাহা হইলে সচ্ছল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহারাও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিবে। তাহাদের এই শতাব্দীর উপযুক্ত হইবার সাধনায় ভারতেরও বড হইবার সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে। Anti-Duhring গ্রন্থে মনীষী Engels এই মতটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—The ultimate causes of all social changes and political revolutions are to be sought, not in the minds of men, in their increasing insight into truth and justice, but in the changes in the mode of production and exchange ; they are to be sought not in the Philosophy but in the Economics of the epoch concerned. (E. Burns. A Hand-Book of Marxism, P. 279)

ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের সব পরিকল্পনার মূলেই রহিয়াছে ভারত-সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি-পরিবর্ত্তনের আশা। সরকারী উৎসাহ আমেরিকার ও রাশিয়ার উৎপাদনে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন আনিয়াছে ; ভারতে শিল্পপ্রসার হইলে এবং সরকারী উৎসাহ থাকিলে এদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবারই সম্ভাবনা। এখানে এখনও যে শোষণ-মনোবৃত্তি লইয়া শিল্পপতিরা ব্যবসা চালাইতেছেন, শিল্পপরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে সমাজতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন রাষ্ট্র যদি সেই ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডী হইতে শিল্পকে উদ্ধার করিয়া দেশের সর্ব্বমুখী কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারেন, তবেই দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধিত হইবে। ভারতের অগণিত শ্রমিক যদি বুঝিতে পারে যে তাহারা জমিদার বা মনিবের মুনাফাবৃদ্ধির জন্য খাটিয়া মরিতেছে না, খাটিতেছে তাহাদের নিজেদের জন্য, তাহা হইলে তাহাদের কর্ম্মশক্তির বিনিময়ে তাহারা নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

ভারতের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত-সরকার যদি স্টার্লিংয়ের প্রভাবমুক্ত একটি নিজস্ব মুদ্রানীতি রাখিতে পারেন এবং আইন করিয়া কৃষি ও শিল্পে আধুনিক উৎপাদনকৌশলগুলি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থার সহিত প্রয়োজনমত ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবসায়ের প্রসারের সুযোগ দেন তাহা হইলে ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দশা খুব সহজেই দূর হইবে। নিজের মুদ্রানীতিতে যদি সামান্য দায়িত্ব থাকে, নিজেদের কল্যাণ-সম্ভাবনায় এখানকার জনসাধারণ তাহা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিবে। ভারতবর্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে অন্য জাতিকে এখানে ব্যবসা করিতে দিতে তাহার আপত্তি থাকার কথা নয় এবং তখন মুনাফার ও শোষণের সুযোগ কমিয়া গেলে বৈদেশিক বাণিজ্য এদেশে আপনা হইতেই কমিয়া আসিবে। ভারতের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জনের জন্য যে নব জাগরণ শুরু হইয়াছে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছে। একে তো কংগ্রেসী আন্দোলনের জন্য ১৯১৪ সালের ভারতে আমদানী শতকরা ৬১ ভাগ বিলাতী মালের স্থানে ১৯৩৯ সালে বিলাতী মাল মোট আমদানীর শতকরা ২৫ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার ভারতবাসীর মন যদি সুব্যবহারের দ্বারা ব্রিটিশ সরকার আয়ত্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ সামান্য বাজারটুকুও তাঁহাদের হারাইতে হইবে। ব্রিটেনের বৈদেশিক সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধেক হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যভুক্ত প্রায় সকল দেশই আজ স্বাবলম্বী, এ অবস্থায় ব্রিটেনের অন্নসমস্যা-সমাধানের একমাত্র আশা চীন ও ভারতবর্ষ। এদিকে ভারতের বাজারে আমেরিকা যখন দৃষ্টিদান করিয়াছে, ভারতীয়দের শুভেচ্ছা ছাড়া সেখানে ইংরেজদের পক্ষে ব্যবসা চালাইয়া যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এখন অন্তত বন্ধুত্বের ভাণ

না করিলে লোকসান তাঁহাদেরই। ভারত-সচিব মিঃ আমেরি এ বিষয়ে তাঁহার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন :—
The man who will direct India's business enterprises or who will control her economic policy will only be willing to accept British coordination and participation if they are clearly convinced that there is behind it no assertion of implication of British domination either of British firms or of British economic policy.

—এবং ভারতীয়দের জাগ্রত চেতনাবোধ প্রত্যক্ষ করিয়া এদেশ সম্বন্ধে বহু-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ আলফ্রেড ওয়াট্‌সন ১৯৪৩ সালের ১৫ই আগস্ট লণ্ডনের Institute of Export-এর সভায় বলিয়াছিলেন :—

Our People in the Country will have no privilege not enjoyed by others. The future British Community in India has to recognise the Indians as an equal and themselves as guests....In plain language we have to abandon any attitude of superiority.

দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের চাপে বাংলার নরনারী

ঈশ্বরের সৃষ্টিমাহাত্ম্যকে বিদ্রূপ করিয়া মহাযুদ্ধ ষষ্ঠ বৎসরের দিকে অগ্রসর হইল। নিঃস্বার্থ দুঃখ সহিবার কীর্ত্তি আমাদের হয়তো শ্বেতপত্রে স্থান পাইবে, কিন্তু যে অদৃষ্ট-পরিচয় গত তিনবৎসর ধরিয়া পাইতেছি তাহা আর বছর কয়েক চলিলে সে গৌরব ভোগ করা সশরীরে সম্ভব হইবে না।

অনেকে বলিতে পারেন—দেশে টাকা বাড়িয়াছে, চাকুরী বাড়িয়াছে, চলমান বিংশ শতাব্দীর প্রাণস্পন্দনের সহিত মুখোমুখী পরিচয় ঘটিতেছে, তবে আর দুঃখ করিবার কারণ কোথায়? বাহির হইতে বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিও হয়তো বলিবেন, গ্রীসে রাজা প্রজা এক টুক্‌রো রুটির প্রত্যাশায় রাস্তায় সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, জার্ম্মানদের বিজয় ও অপসরণের মধ্যে রাশিয়ার জনসাধারণ কি অমানুষিক কষ্টই না সহ্য করিল, আর যুদ্ধের জন্য সামান্য সৌখীন সামগ্রী বিদেশ হইতে আসিল না বলিয়া যথেষ্ট টাকা এবং যথেষ্ট চাকুরী ও যুদ্ধভাতা পাইয়াও বাংলার অধিবাসিগণ যে সুখী হইতে পারিল না, ইহা তাহাদের পক্ষে সত্যই লজ্জার কথা। পরের সম্বন্ধে বড় কথা বলিতে পয়সা খরচ নাই, সুতরাং আমাদের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য দুঃখ অনেকেই অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু বাংলা দেশে বাস করিয়া এবং ঐতিহাসিক উনিশশো তেতাল্লিশ সাল পার হইয়া আমরা নিজেদের সম্বন্ধে এতখানি অবিচার করিতে পারি না। আমরা দরিদ্র জাতি, পরের অধীনে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া কোন মতে আমাদের পৈতৃক প্রাণটুকু বজায় রাখিয়া চলি। এতকাল যাহোক করিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছিল, আমরাও

আবিসিনিয়ায় ইটালীর অমানুষিকতা আর রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীজোড়া খ্যাতির ভাঙ্গাইয়াই পরম আনন্দে কালক্ষেপ করিতেছিলাম, হঠাৎ মন্বন্তর আসিয়া সব ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। রিক্ততার নগ্নরূপ এমন করিয়া আর কখনও দেখি নাই বলিয়া আকস্মিক আঘাতে আমাদের ঘুণ ধরা মস্তিষ্কে আজ চিন্তা করিবার প্রেরণা আসিয়াছে। আপাতমধুর সুযোগ সুবিধা যুদ্ধের দৌলতে আমরা কিছু কিছু লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু এই সুযোগ যুদ্ধশেষে যেদিন দুর্যোগ হইয়া দাঁড়াইবে, আজ অতি কষ্টে মাথা বাঁচাইবার অস্থায়ী তৃপ্তি সেদিন সব হারাইবার লজ্জায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। মূল্যবান হোক বা না হোক, যুদ্ধের আমলে আমরা টাকার মুখ দেখিতে পাইয়াছি, কিন্তু মুদ্রানীতির এই অনিশ্চিত অবস্থা আসলে আমাদের পক্ষে কতখানি বরণীয় ও কল্যাণপ্রদ, সেকথা চিন্তা করিয়া দেখিলে হতাশ হইতে হয়। সম্প্রতি বাংলার বুকে যে দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এবং যাহার জের মিটিতে এখনও বহুদিন লাগিবে তাহা শতকরা আশীজন কৃষিজীবী ও কৃষির উপর নির্ভরশীল অধিবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে; চাকুরী বা যুদ্ধভাতার সুবিধা যাহারা লাভ করিতেছে তাহারা অধিকাংশই ভদ্র এবং শিক্ষিত অথবা শিল্পশ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। কর্ত্তাদের কলমের আঁচড়ে নোটের গোছা মুদ্রাযন্ত্রের অন্ধকার গহ্বর হইতে আলোকে আসিতেছে, ১৯৩৯ সালের ১৭৮ কোটি টাকার স্থানে এখন ৯০০ কোটি টাকার নোট ছাপান হইয়াছে, কিন্তু এই নোটগুলি যাঁহারা পকেটস্থ করিতেছেন তাঁহারা দেশের জনসাধারণ নহেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা আঙ্গুল দিয়া গোনা যায়। ভাগ্যবান ব্যবসাদার বা জোগানদার এসব ব্যক্তি কোন্ সৌভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধের মুখ দেখিয়াছিল জানিনা, হয়তো এই মহাসমরের দৌলতে তাহাদের অধস্তন চতুর্দ্দশ

পুরুষের গতি হইয়া গেল ; কিন্তু মারাত্মক বর্দ্ধিত ব্যয়ের হাত হইতে চাকুরী ইত্যাদি পাইয়া যাহারা উপস্থিত কোন ক্রমে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা ভবিষ্যতে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে ইহা বাস্তবিকই ভাবিবার কথা। অন্নের সন্ধানে আজ বহু নারীর অবগুণ্ঠন ঘুচিয়া গিয়াছে, শিক্ষিতা অনেক মহিলা যুদ্ধসম্পর্কিত চাকুরী লইয়াছেন, যুদ্ধ যেদিন শেষ হইবে সেদিন তাঁহাদের অফিসগুলি উঠিয়া গেলেও অর্থের প্রয়োজন এবং অর্থোপার্জ্জনের নেশা তাঁহাদিগকে ছাড়িবে কি ? স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনই স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু লোক যুদ্ধের জন্য স্থান পাইয়াছে, যুদ্ধান্তে ইহারাই স্বস্থানে বহাল থাকিবে কি না সন্দেহ, বেকার কর্ম্মপ্রার্থিনীদের সেদিন যে চাকুরী সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই সর্ব্বব্যাপী স্থানচ্যুতির সমস্যাই এখন যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং ইহার সহিত আমাদের সমাজ-জীবনেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফিউডাল যুগের শ্রেণীগত নিশ্চেষ্টতা আজও এদেশে শিকড় গাড়িয়া আছে, লর্ড কর্ণওয়ালিশের ভুলের মাশুল দিতে বিংশশতাব্দীর সঞ্চরমাণ যন্ত্রসভ্যতার প্রাণস্পন্দন বাংলার বুকে এখনও শোনা যায় নাই বলিলেই হয়। বন্যা আসিলে প্রস্তুত থাকার একটা বিশেষ মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনে যাহারা অভ্যস্ত এবং জীবিকা সংস্থানের সংকীর্ণ গণ্ডীতে যাহারা নিজেদের নিঃস্ব ও অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা বানের মুখে পড়িলে নিরুপায়ের লাঞ্ছনার আর শেষ থাকে না। সাত সমুদ্র পারের গতবার যুদ্ধের সময় নানারূপ আশার মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষকে একান্ত আপনজন রূপেই পাশে পাইয়াছিল, সেদিন স্থান-কাল-পাত্রের বিভেদ ভুলিয়া আমরা লাভের লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেই

যুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভালোয় ভালোয় শেষ হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের আলোয় আলোয় বিদায়-পুরস্কার লাভ ঘটে নাই। তারপর বহু দুঃখের ভিতর দিয়া এদেশ জগতের আসরে আপনার স্থান প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। নিতান্ত নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রভূত অসুবিধা স্কন্ধে বহিয়া আমরা যাহা কিছু করিয়াছি তাহার মূল্য দিতে আমাদের ঘরের পানে তাকানো সম্ভব হয় নাই। অপেক্ষাকৃত উন্নত জনমণ্ডলী যেমন একদিকে অগ্রসরণের মোহে ভুলিয়া দেশকে নিবিড়ান্ধকার হইতে মুক্তি দিবার প্রয়াস-সাধনের সুযোগ পান নাই, অন্যদিকে তেমনি উদাসীন সরকারের নিরুৎসাহে জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পশুশৌর্য্য আজ পুরাতন আর্য্য-অভিযানের প্রেরণা নবজাগ্রত জাতিদিগের মনে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, দুর্ভাগ্য-ক্রমে উপনিবেশের দাবী সভ্যজাতির দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইবার উজ্জ্বল যুগসন্ধিক্ষণেও আমরা নিজবাসভূমেই পরবাসী থাকিয়া গেলাম। কিন্তু এই লজ্জাকর নিশ্চেষ্টতার ফল হইল এই যে, আঘাত-সংঘাতের প্রথম স্পর্শেই আমাদের পথ চলা শেষ হইয়া গেল। ভূমি-ব্যবস্থার জগদ্দল পাষাণ বুকে বহিয়া বাঙ্গালী একদিন কুক্ষণে মাটিকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিল, আজ শতাব্দীর রস-নিঃসরণের ক্লান্তিতে সে মাটি মা হইবার যোগ্যতা হারাইয়াছে। বাহিরের জীবনে রাষ্ট্রগত বহু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, জাতির পর জাতি দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া আমাদের নির্লজ্জভাবে লুণ্ঠন করিয়াছে, কিন্তু যে সামাজিকতা মনু মহাভারতের যুগে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার অবিকৃত রূপ শত ভাঙ্গনের তীব্র গতিবেগকে ঠেকাইয়া রাখিয়া আজও সারা দেশে অপ্রতিহতভাবে প্রভুত্ব করিতেছে। এই সামাজিক বিধিনিষেধের চাপেই পথ চলা আমাদের বিঘ্নসঙ্কুল ; ধর্ম্মপ্রাণতার নেশায় বস্তুতান্ত্রিক জগতের

জীব হইয়াও আমরা সত্যযুগের অধিবাসী হইবার অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছি। এতদিন জিনিসপত্র আসা যাওয়ার ব্যবস্থা সহজ ছিল বলিয়া অতি সরল জীবনযাপন প্রায়-নিঃস্ব আমাদের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠে নাই। আয় যতই কম হউক, ব্যয় অত্যন্ত কম থাকায় মৃত্যুদেবতাকে সামান্য দক্ষিণা দিয়াই আমরা এতদিন রেহাই পাইয়াছি। শহরে রাষ্ট্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সারা দেশের নামে নূতন নূতন আইন-কানুনও সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সত্যকার দেশ মাঠে, হরিসভায় আর শয়নঘরে কাটাইয়া আসিয়াছে চিরকাল।

ক্রমে একদিন স্বাস্থ্যহীনতার অজুহাতে ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ আহত হওয়ায় শহরে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে, শহরের সংখ্যাও বাড়িয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। গ্রাম হইতে শহরে আসিয়া বাঙ্গালী ভিড় বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উৎসাহ তাহাদের মধ্যে শুরু হয়, সমাজবিধানের অপনীতির দরুণ ব্যবসায়ীদের অনেকেই অন্তত ভয়ে ভক্তি পাইবার লোভে ব্যবসা গুটাইয়া বিত্তবিভব জমিতে আটকাইয়া ফেলায় সে উৎসাহ অল্পদিনেই ম্লান হইয়া পড়ে। এই জমিদারী-বিস্তৃতির মোহ একদিক দিয়া বাংলার সম্ভাব্য শিল্পবিপ্লবকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অর্থশালীদের অর্থ যদি জমিতে আটকাইয়া না যাইত, তাহা হইলে সেই অর্থে নূতন অর্থ আমদানী করিয়া দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থাকে সবদিক দিয়া ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইত। শিক্ষার প্রসার হয় নাই অর্থের অভাবে, শাসনব্যবস্থার সংস্কার হয় নাই জন-সাধারণ অশিক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া। আমরা আইন-সভায় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছি সত্য, কিন্তু সেই- প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের বেলায় তাঁহার কৃতিত্ব যাচাই করিয়া দেখিবার যোগ্যতা আমাদের ছিল না। দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া আমাদের নামে যাঁহারা আমাদের দেশ

চালাইয়াছেন, তাঁহারা আর যাহাই করিয়া থাকুন, এই দেশবাসীর মুখের পানে নিঃস্বার্থভাবে চাহেন নাই বলিয়াই আজ বাংলার এই শোচনীয় অবস্থা। আত্মসম্মানহানির আশঙ্কায় আত্মহত্যা করিবার উপদেশ কোন বুদ্ধিমান লোকই দেন না সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রে মানুষ হইয়া যাঁহারা আমাদের দুঃখের দিনে নিশ্চিন্ত বিলাসে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন মনে করেন না, জীবন-মূল্য দিয়াও এদেশের লোক যে তাঁহাদের দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না, আমাদের দুঃখ সেইখানে।

যুদ্ধ এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে শুরু হইবার আগে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত হইবার যথেষ্ট সময় ছিল। সেই সময়—ইচ্ছায় হউক বা অকর্ম্মণ্যতার দরুণই হউক—নষ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে একদিকে যন্ত্রপাতির আমদানী যেমন বন্ধ হইয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশের অবশ্যপ্রয়োজনীয় ঘাটতি-খাদ্যদ্রব্যাদি বাহির হইতে আনাও সম্ভব রহিল না। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকার জন্য অবস্থার গুরুত্ব হঠাৎ অধিকাংশ দেশবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, তাই ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধির প্রথম অবস্থাকেই চরম ভাবিয়া লাভের লোভে ঘরের সঞ্চয় পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ তাহারা অন্ধকার করিয়া ফেলিল। জাপানী যুদ্ধের প্রথম বৎসর কাটিয়াছিল জোড়াতাড়া দিয়া। তারপর যুদ্ধের গতি ঘোরালো হইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের পণ্যমূল্য-রেখা যখন বাড়িয়া চলিতে লাগিল, অথচ জমিদারী কায়েমী রাখিবার স্বার্থে ছোটবড় সকলেই নিজের বাঁচিবার নামে প্রভূত আয়োজন ও অপব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, দেশের শতকরা নব্বই জনের অবস্থা তখন হইয়া উঠিল অসহায়। তাছাড়া সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের শ্বেতবাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার উপর নিবদ্ধ হওয়ায় কাঁচামালের অভাবেও দেশে শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইয়াছে

এবং ফলে অন্নসংগ্রহ যাহারা নানাভাবে নিজের চেষ্টায় করিতে পারিত তাহারাও জনতার ভিড়ে উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পায় নাই। এতবড় দেশে প্রয়োজনের তাগিদে যথেষ্ট শিল্পপ্রসার হওয়া উচিত ছিল, এই যুদ্ধে সরকারী ঔদার্য্যের ফাঁকে আমরা হয়তো সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারিতাম, কিন্তু শ্রমিক ও কাঁচামালের অভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটিবার অজুহাতে সরকার কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ করায় শিল্পাদি আশানুরূপ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সরকারী প্রয়োজন মিটাইয়া অসংখ্য লোক আজও বেকার জীবন যাপন করিতেছে। বাঁচিবার সামান্য উপায় থাকিলেও বাংলার সহস্র সহস্র হতভাগ্য অবশ্যই চুপ করিয়া অনাহারে মৃত্যুবরণ করিত না। এতদিন পরে সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য সামান্য পরিমাণ এলুমিনিয়াম লৌহ বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে, স্টীল ও নানাবিধ ধাতু নিয়ন্ত্রণ চলিতেছে মহাসমারোহে। স্বার্থপরতার নির্লজ্জ অভিনয়ে দেশী ও বিদেশী যাঁহারা সারাদেশকে বাঁচিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত করিলেন তাঁহাদের দোষ বা বিচারের কথা তোলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু দৈহিক অস্বাস্থ্য-হীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ত্রুটির জন্য যে মনের অধঃপতন সারাদেশে সংক্রামিত হইয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে যাহারা কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিত, তাহাদের অবস্থাই আজ সবার চেয়ে শোচনীয়। জমি বিক্রী হইয়া গিয়াছে, রোগে শোকে তাহারা অনেকেই নিঃসম্বল, কেহ কেহ সরকারী বেসরকারী দানে ধন্য হইবার জন্য শহরের ফুটপাথ আশ্রয় করিয়া শেষপর্য্যন্ত মৃত্যুবরণ করিয়াছে, কেহবা ভাগ্যক্রমে স্থান পাইয়াছে সরকারী অতিথিশালায়। যাহারা গ্রামে অতি কষ্টে বাঁচিয়া ছিল, সাময়িক অসুবিধার জন্য জমির

নূতন মালিক দু' তিনগুণ মজুরী দিয়া হয়তো তাহাদের খাটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মজুরীর এই হার তো চিরদিন থাকিবে না। জমির সম্পূর্ণ ফসল পাইয়াও যাহাদের চলিত না, ভাগে জমি চাষ করিয়া অর্দ্ধেক ফসলে কি করিয়া তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে? আমাদের বাংলা দেশের অধিকাংশ কৃষিজীবীরই বর্ত্তমানে এই অবস্থা। জমিহীন কৃষকদের হয় জমি ফিরাইয়া দিতে হইবে, আর না হইলে তাহাদের জন্য অন্য উপজীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতসরকারের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদিগকে কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার টাকা ধার দিবার ও যুদ্ধকালে বিক্রীত জমি সামান্য কিস্তিতে ঋণ শোধের দ্বারা ফিরাইয়া দিবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা তো সরকারী আইন নয়। জমি-হারানো কৃষকদিগকে শিল্পশ্রমিকরূপে দেখিবার কল্পনায় যাঁহারা বিভোর, তাঁহারাও কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন যে, দুই তিন কোটি লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা বাংলার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সম্ভব হইবে? নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন শিল্প প্রসারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া সরকার শুধু শ্বেতস্বার্থসংরক্ষণের সুবিধা করিয়া দেন নাই, ভাগ্যবিড়ম্বনায় যাহারা সাতপুরুষের সাধের ক্ষেতখামারের মায়া কাটাইয়া বাধ্য হইয়া অন্যত্র ঘর বাঁধিতে চলিয়াছে, তাহাদের বাঁচিবার পথও জানিয়া শুনিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। দুটি মহাযুদ্ধের সুযোগে সাম্রাজ্যভুক্ত অস্ট্রেলিয়া, সাউথএ্যাফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশ প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে অথচ আমাদের দেশে সুযোগ ও সুবিধা যথেষ্টপরিমাণ থাকা সত্ত্বেও শিল্পপ্রসার মোটেই আশাপ্রদ হইল না। শিল্পের প্রসার যদি হইত, তাহা হইলেও এই সব কৃষকদের

একটা নিশ্চিত আশ্রয় আছে মনে করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন যাহারা সাধারণের দয়ায় বাঁচিয়া আছে, কিছুদিন পরে যুদ্ধ থামিলে তাহারা কাহার উপর নির্ভর করিবে কে জানে।

অথচ এই কৃষকদের মধ্যেই সবচেয়ে অধিক পরিমাণে সামাজিক বিপ্লব ঘটিযা গিয়াছে। মন্বন্তরের চাপে ইহাদের অনেকে বাধ্য হইয়া শহরে আসিয়াছিল, অন্নের সন্ধানে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার আবর্ত্তে পড়িয়া তাহাদের ন্যায়, নীতি ও মর্য্যাদাবোধ ভাসিয়া গিয়াছে। যাহারা ক্যাম্পে নীত হইয়াছে, তাহারা দীর্ঘকাল আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে বাধ্য হইবে। গ্রাম হইতে আসিবার সময় পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর সহিত যে নারী শহরে পা দিয়াছিল, সরকারী অতিব্যস্ততায় হয়তো তাহাকে একাকিনী ক্যাম্পে আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং তাহাকে ফিরিতে হইবে একেলাই। তাহার পক্ষে এই অবস্থায় পদস্খলন হওয়া যেমন সম্ভব, ফিরিয়া গেলে অবিশ্বাসের বোঝা বহিবার শক্তি তাহার না থাকাও তেমনি স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে এমনি একদল নরনারী সহস্র বৎসরের সমাজনীতিকে অস্বীকার করিয়া পথে নামিয়া আসিলে তাহারা তাহাদের পরিচিত আরও দশজনকে প্রভাবিত করিয়া দলে আনিতে চেষ্টা করিবে। শহরে বৈদ্যুতিক আলোর চোখঝল্সানো ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে যে পাপ-প্রবৃত্তি লুকাইয়া আছে তাহাও বহু অসহায় তরুণ-তরুণীকে গ্রাস করিয়াছে সন্দেহ নাই। একদল মানুষ-বেশী বিচিত্র জীব এই সকল সর্ব্বহারাদের ধ্বংস করিয়া নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করিবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ যখন হইয়াছে তখন দুর্ভাগা যাহারা অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্ধকারে হারাইয়া গেল, তাহাদের অপমৃত্যু দুর্ভিক্ষের অনিবার্য্য মাশুল বলিয়া ধরিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। সমাজের এই আসন্ন ভাঙ্গনের

মুখে কঠোর হস্তে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সরকারী আইন যদি দাঁড়াইতে পারে এবং পুরাতন জীবনযাপনের সুযোগগুলি যদি গ্রামছাড়া গ্রামবাসীদের হাতের কাছে আনিয়া দিতে পারে তাহা হইলে হয়তো গ্রামের সমাজ এবারের মত বাঁচিয়া যাইবে। এ ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে একমাত্র উপায় শিল্পপ্রসার। শিল্পশ্রমিকদের জীবনযাত্রার ইতিহাসে নৈতিক বাঁধনের কঠোরতা বা গ্রামের রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নাই, কাজেই যদি এই সব সমাজবহির্ভূত নরনারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আশ্রয় পায় তাহা হইলে শিল্পজগতে নূতন সূর্য্যের উদয়ে জগতের উন্নতিশীল অন্যান্য জাতির পাশে দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জনে অন্য সব ক্ষতিই আমাদের সহিয়া যাইবে। সংস্কারগত এই স্খলনটুকু এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয় এবং পরিচালনার ভার যোগ্যহস্তে পড়িলে এ চাঞ্চল্য স্থির হইতে বেশীদিন সময়ও লাগিবে না।

কৃষকদের কথা এই প্রবন্ধে দীর্ঘ করিয়া বলা হইল এইজন্য, যে ইহারাই বর্ত্তমান মন্বন্তরে সব চেয়ে অধিক পরিমাণে আঘাত পাইয়াছে। সস্তার দিনেও তাহারা যাপন করিত দরিদ্র জীবন, তখনই কোন অসুখ বা অন্য আকস্মিক ব্যয়ের পর তাহাদের উপবাস দিতে হইত, এবার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উপর কতকটা সরকারী নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে এবং কতকটা নিজেদের লোভের জন্য তাহারা দলে দলে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ হইয়াছে যুদ্ধের জন্য, অথচ ভারতসরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে যেমন মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছেন, এই দুর্ভিক্ষ দূর করিতে তাহার সামান্য অংশও করেন নাই। সম্মিলিত জাতিসমূহের পুনর্গঠন-কমিটি তো প্রথমে ফতোয়া জারি করিয়াছিলেন—দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবর্ষকে তাঁহারা কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না, কারণ

এই দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধের যোগ নাই, ইহা ঘটিয়াছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণের পর আমাদের ভরসা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু প্রাপ্তির আশায় বার বার ঠকিয়াছি বলিয়া পুনর্গঠনের এতবড় সুযোগের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মুখে হাসি ফুটিতেছে না। এদিকে অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে আশু সাহায্য না পাইলে বাংলাদেশের শতকরা আশী জনের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও দুষ্কর হইবে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর যাহারা কায়ক্লেশে অখাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া ছিল তাহাদের শরীরের বহির্ভাগে ভাঙ্গন তেমন ভাবে প্রত্যক্ষ না হইলেও স্বাস্থ্য যে তাহাদের একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা বর্ত্তমানের মহামারীক্লিষ্ট বাংলাকে দেখিলেই বুঝা যায়। ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে দেশের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ অধিবাসী আক্রান্ত হইয়াছে। সরকারী কৃপাদৃষ্টি অজস্রধারায় ঝরিয়া না পড়িলে শুধু দেশবাসীর সাহায্যে প্রায় তিন কোটি নিঃস্ব হতভাগ্যকে বাঁচাইয়া তোলা কিছুতেই সম্ভব নয়। সৈন্যবিভাগে যাহারা নিযুক্ত, তাহাদের জন্য সামরিক তহবিল সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু যাহারা জমি হারাইয়া কৃষক বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকারীও রহিল না, তাহাদের জন্য কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থাই যুদ্ধোত্তর পুনঃসংগঠন-পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই। কৃষি-সম্পর্কেও যে সকল কথা সরকারী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই বাগাড়ম্বর মাত্র, কাজের বেলায় সে-গুলির মূল্য কতখানি পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। পতঙ্গনিবারণ, খালখনন, উন্নততর রাসায়নিক সারের ব্যবস্থা, কৃষিজীবীদের অবসরে উপজীবিকা—এসব কথা আমরা যুদ্ধের আগেও শুনিয়াছি। মিঃ জন সারজেণ্টের শিক্ষা-পরিকল্পনা ব্যাপক এবং সত্যই

কল্যাণপ্রদ, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের অজুহাতে ইহা নাকচ হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই বড়লাটের কলিকাতা-বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থের অজস্রতা পাছে দ্রব্যাদি বিনিময়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে এইজন্য মুদ্রা-সম্প্রসারণ বন্ধের অজুহাতে লটারির নাম করিয়া ভারতসরকার জন-সাধারণের টাকা সরকারী কোষাগারে আটকাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও আমরা বিদেশের বহু পত্রিকায় ও বিজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি। অবশ্য ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করিবার যে-কোন প্রচেষ্টাকেই আমরা সাধুবাদ দিতে পারি, কিন্তু এমনি জুয়া-খেলার আশ্রয় না লইয়া শিল্পাদিগঠনে উৎসাহ দিলে এবং শিল্পপ্রচেষ্টা সম্ভব করিতে কাঁচামালের জোগানের নিয়মিত ব্যবস্থা করিলেও তো বাড়তি টাকায় স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারিত। মুদ্রাবৃদ্ধির সহিত পণ্যবৃদ্ধি তাল রাখিয়া চলিলে তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে না, বরং ঘরের টাকায় পরের টাকা ঘরে আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইলে দেশের আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়া উঠে। বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় কাগজী মুদ্রার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে দেশের ক্ষতি না হইয়া লাভের পথই খুলিয়া গিয়াছিল। আসল কথা, জমিদারী মনোভাব একটু কমাইলেই এই মুদ্রাসম্প্রসারণ দ্বারাও দেশের কল্যাণ করা সম্ভব হইতে পারে।

যুদ্ধে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয় নাই এমন অনেক দেশবাসী যুদ্ধের পরে বেকার হইয়া যাইবে, অথচ তাহাদের স্থান হইতে পারে এমন নূতন শিল্পগঠনের ব্যাপক ব্যবস্থার কথা ভারতসরকারের পরিকল্পনায় আশানুরূপ স্থান পায় নাই। নবগঠিত জাতীয় শিল্পাদি দাঁড় করাইতে যে রাজবৃত্তি এবং সংরক্ষণ-সুবিধাদানের আবশ্যকতা আছে তাহাও উক্ত পরিকল্পনায় জোরের সহিত বলা হয় নাই। শুল্ক বা শিল্পের অবস্থা লইয়া

বাদানুবাদ এদেশে নূতন নয় এবং তাহাতে দেশের কল্যাণ হইলেও এখন প্রয়োজন অধিকতর পরিমাণে নূতন ও বৃহৎ শিল্পগঠনের। মিঃ সারজেণ্টের শিক্ষা-পরিকল্পনায় বৃত্তিশিক্ষার যে উল্লেখ আছে তাহা কার্য্যকরী হইলে সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা ছাত্রের পক্ষে একই সঙ্গে সম্ভব হইবে। যে শিক্ষার অভাবে এত বড় দেশের চল্লিশ-কোটি অধিবাসী সামান্য ব্যবহার্য্য বস্তুর জন্যও পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে তাহাদের স্বাবলম্বী হইবার পরম প্রয়োজন স্বীকার করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে উদার হওয়া সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের কপালে সুখের মুখ দেখা নাই; জাপান যুদ্ধে হারিয়া 'কোরিয়া' ফিরাইয়া দিবে, অথচ আমরা অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কুকুর-বিড়ালের মত অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মৃত্যুবরণ করিব—এই দুটি কথা একসঙ্গে মনে করিলে অস্বস্তি বোধ করা ছাড়া আমরা আর কি-ই বা করিতে পারি। লাহোর কংগ্রেসের পর গান্ধীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়, করাচী কংগ্রেসে, ফৈজপুর কংগ্রেসে—জাতীয়তাবাদিগণ বার বার কৃষকদের খাজনার হার কমাইবার ও উন্নততর কৃষিকার্য্যের সুবিধা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যকরী করা যাঁহাদের হাতে ছিল তাঁহারা অনুকম্পার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে আর উপায় কি?

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সকল বাঙ্গালীই এই দুর্ভিক্ষের চাপে জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। জনকতকের লক্ষপতি হইবার ফলে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে নাই, অধিকাংশ অর্থই আটক পড়িয়াছে ব্যাঙ্কের খাতায়। এই টাকায় শিল্পপ্রসার হইলে বহুলোকের স্থায়ী অন্নসংস্থান হইতে পারিত এবং ভূমিহীন কৃষকেরা শ্রমিকরূপে ও কর্ম্মহীন শিক্ষিত নরনারীরা কর্ম্মচারীরূপে পরিবার প্রতিপালনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে তবেই দেশের সুখশান্তি ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা' থাকিত।

অপেক্ষাকৃত ধনিকশ্রেণীর ও ভাগ্যবান ব্যবসাদারদের যুদ্ধের আমলে প্রভূত আয়বৃদ্ধি হইবার ফলে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে ও এ বৎসর তাহার জের মিটাইতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের যে টাকা পোস্ট অফিস সেভিং ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছিল তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রশ্রেণী নিঃস্ব হইয়া মৃত্যুর দুয়ারে অপেক্ষা করিতেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমস্ত সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে; ইহার পর যদি এই অবস্থা একভাবে দীর্ঘদিন চলিতে থাকে, দেশের কয়েকজন ধনী ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে প্রাণটুকু বাঁচাইয়া রাখাও সম্ভব হইবে কি? যুদ্ধ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যুদ্ধ জয় বা দুর্ভিক্ষ জয় করিলেই আমাদের সমস্যা শেষ হইয়া যাইবে না। ভাঙ্গিয়া পড়া অর্থনৈতিক বনিয়াদ যদি গড়িয়া না তোলা যায়, অনাহারের অনুশোচনায় ম্লানমুখ ভদ্র দরিদ্রের ও সর্ব্বহারা ক্ষুধিত কৃষকদের যদি বাঁচিবার পথ দেখান না হয় এবং নির্ব্বিকার সরকারের মনে যদি এ দেশ সম্বন্ধে বিবেচনা-বোধ না জাগে, তাহা হইলে আমাদের আর কোনই আশা নাই। আমেরিকার ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের হট্‌স্প্রিং কনফারেন্সে দারিদ্র্যকে সব সমস্যার মূল বলা হইয়াছে এবং বেকার-নিরোধী ব্যবস্থায় ও পরিবার পিছু সরকারী বৃত্তিদানে দারিদ্র্য-নিরোধ সম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের সরকারও যদি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বেসামরিক জনগণের জন্য এই পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা না করেন এবং জনগণের শিক্ষা ও বেকারদের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া না নেন, প্রচারের বেলায়* তাঁহারা ভারতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আটটি শিল্পপ্রধান দেশের অন্যতম বলিয়া যতই অন্যজাতির কাছে নিজেদের

* **Fifty facts about India.**

কান্তিমানরূপে জাহির করিতে থাকুন, বাংলার তেরশো-পঞ্চাশী মন্বন্তর আগামী দশ বৎসরেও শেষ হইবে না।

বাংলার দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩

দিনপঞ্জিকার হিসাবে পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পঞ্চম বৎসর শেষ হইতে চলিল। জাতীয়তা-বোধের গৌরবে যাহারা সব কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের কাছে এই সুদীর্ঘ সময়ের গুরুত্ব নাও থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের মত যাহাদের কপালে শুধু উদ্বেগ আর নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের অবস্থা আজ সত্যই শোচনীয়।

পরের অধীনে আছি আমরা বহুদিন, কিন্তু এখনকার মত এমন নিঃস্ব ও অসহায় বোধ আগে কখনও করি নাই। এই শতাব্দীতে মানুষের জীবনমান অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, বর্দ্ধিত ব্যয় মিটাইতে যে আয়-বৃদ্ধির প্রয়োজন, সে কথার গুরুত্বও এখানে সম্যক্‌ভাবে অনুভূত না হওয়ায়, কি শাসকসম্প্রদায় আর কি দেশবাসী, সকলেই দায়িত্ববিহীন সরল জীবনধারার প্রতি এতকাল অহেতুক অনুরাগ দেখাইয়া আসিয়াছেন। শুধু কৃষির উপর এতবড় একটা দেশের চলে না, অন্তত চিরকাল চলে না, একথা সকলেই জানে। কিন্তু শিল্পের প্রসার কতকটা সরকারী নিশ্চেষ্টতায় ও কতকটা অর্থবান ব্যক্তিদের অবহেলায় এদেশে সম্ভব হয় নাই। আয় যে নাই ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। তবু যাঁহারা আমাদের অভিভাবক, তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি সময়মত লাভ করিলে হয়ত আমাদের এরূপ অকূল পাথারে পড়িতে হইত না।

চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউস্থ বাংলা সরকারের স্থায়ী শিল্পপ্রদর্শনীতে ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এদেশে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহাতে কৃষকদের দুঃখ ঘুচিবে। তখন যুদ্ধের প্রথম অবস্থা এবং যুদ্ধ চলিতেছিল সাত সমুদ্র তের নদী পারে। জাপান তখনও যুদ্ধে নামে নাই, আমেরিকা তখনও ভবিষ্যৎ-বীরত্বের কোন লক্ষণই দেখায় নাই। যুদ্ধের নামে সেদিন ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হইবার স্বপ্ন দেখিতেছিল; তাহার একান্ত আশা ছিল—যেসব শিল্প এদেশে স্থাপিত হয় নাই তাহা এইবার স্থাপিত হইবে এবং যেগুলি ছোট আকারে আছে তাহাদিগকে সারাদেশের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী করিয়া বাড়াইয়া তোলা হইবে। সেদিন খাদ্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে কৃষকের লাভের সম্ভাবনা ছিল, কারণ তখন পর্য্যন্ত পণ্যমূল্য সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় নাই। জীবনমান তখন সর্ব্বসাকুল্যে শতকরা মাত্র কুড়ি-পঁচিশ ভাগ বাড়িয়াছিল, যুদ্ধব্যবস্থার নানা প্রয়োজনীয় অর্ডারে ও কাজকর্ম্মে দেশের সচ্ছলতাও সেই মূল্যরেখার কাছাকাছি ছিল বলিয়া সেদিন দেশে অভাবের অভিযোগ অনেকটা কম শোনা যাইত। যদিও জার্ম্মানী আমাদের আমদানী-বাণিজ্যে তৃতীয় এবং রপ্তানী-বাণিজ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিত এবং তাহার যুদ্ধঘোষণার ফলে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র, চামড়া পাকা করিবার মশলা, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত ও নানাপ্রকার ধাতুর আমদানী এদেশে বন্ধ হইয়া গেল, তথাপি আমরা আশা করিয়াছিলাম জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে উপরোক্ত জিনিসগুলি আনাইয়া আমরা কাজ চালাইয়া দিব এবং সরকারী চেতনা ও উদ্বিগ্নতার সুযোগে যতদূর সম্ভব নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা

এদেশেই করিয়া লইব। ভারতসরকার চিরকালই আমাদের স্বার্থসম্বন্ধে একটু দেরী করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং এ ক্ষেত্রেও সেই নীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। ভারতে শ্বেত-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ কি হইবে ইহা চিন্তা করিতেই ভারতসরকারের পূরা দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল, এবং ১৯৪১ সালের শেষদিকে সমস্ত পৃথিবীকে চমকিত করিয়া জাপান ও আমেরিকা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতদিন যাঁহারা আজ নয় কাল করিয়া আয়োজনে অযথা বিলম্ব করিতেছিলেন, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরই তাঁহাদের টনক নড়িল। কিন্তু সময় থাকিতে অবহিত না হওয়ার ফলে অবস্থা আয়ত্তে আনা আমাদের শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষে আর সম্ভব রহিল না।

তাহার পরই দেশে হাহাকার উঠিল। অতি অল্প কালের মধ্যেই জাপান সুদূর প্রাচ্যে দেশের পর দেশ জয় করিয়া লইয়াছে এবং পিছাইয়া আসিবার পরিকল্পনায় মিত্রপক্ষ নিজস্ব একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলায় কম ধান জন্মাইতেছিল। একে তো ভারতবর্ষে সাধারণত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য, পৃথিবীতে গড়পড়তা একর পিছু ধান্য উৎপাদন যখন ১৪৪০ পাউণ্ড, ভারতবর্ষে তখন মাত্র ৯৮৮ পাউণ্ড ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহার উপর আবার কৃষিজীবী দেশ হওয়ায় আয়ের স্বল্পতার জন্য এখানকার অধিকাংশ লোকের জীবনমান খুবই অনুন্নত। নিজেদের ভাল শস্য বিক্রয় করিয়া বিদেশী সস্তার চাউল প্রভৃতি খাইয়া এদেশের কৃষকেরা এতদিন কায়ক্লেশে বাঁচিয়া ছিল। তাই একদিকে আমাদের খাদ্য উৎপাদন যতই কম হইতেছিল, অন্যদিকে ততই বার্ম্মা ও অস্ট্রেলিয়া হইতে চাউল ও গম আমদানী বাড়িতেছিল। সেদিন সুস্থ অবস্থায় এই আমদানী-বৃদ্ধিতে আমরা ভয় পাইবার কোন

কারণ দেখি নাই। তারপর জাপানের যুদ্ধ-ঘোষণায় বার্ম্মা হস্তচ্যুত হইলে ও সমুদ্রপথ বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিলে ১৯৪২ সালে খাদ্য-শস্যের আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধের সময় সৈন্য ও যুদ্ধে সাহায্য-কারীদের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া এবং বন্দীদের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিয়া সরকারের দিক হইতেও অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্যশস্যের মজুতদারী ও অপচয়ের ব্যবস্থা হয় এবং যে পরিমাণ শস্য মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি স্থানে পাঠান হয় তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। সরকারের ব্যস্ততা ও মজুত করিবার এই প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে দেশের সচ্ছল ব্যক্তিদেরও মনে স্থানলাভ করে এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিও বাজারের অবস্থা দেখিয়া খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিবার জন্য সচেষ্ট হন। বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বাড়তি শস্যক্রয়ের হুজুগে এবং সরকারের স্বার্থপর পরিকল্পনায় বাজারের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ খাদ্য-শস্য অন্তর্হিত হয় এবং ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার চরম সুযোগ লইবার আগ্রহে খাদ্যশস্যের ব্যবসাদারগণ পণ্যাদির মূল্য ক্রমেই বাড়াইতে থাকেন। সেই সময় জনসাধারণ সামান্য সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন করিয়াছিল বলিয়া স্বাভাবিক দরিদ্র এই দেশে অবস্থার শোচনীয়তা প্রথম হইতেই ততখানি হৃদয়ঙ্গম করা যায় নাই।

একে উৎপাদন কম ও আমদানী নাই, তাহার উপর সরকার জিনিস-পত্র আটকাইবার যে অহেতুক ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন, তাহারই ফলে জোগান ও চাহিদার মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য ঘটিয়া গেল। বিশ্বভ্রমণকারী অন্যতম মার্কিন সেনেটর রালফ ব্রুস্টার যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ব্রহ্ম হইতে যে শতকরা ১০ ভাগ চাউল আসিত, সংগৃহীত শস্যের উপযুক্ত বণ্টন-ব্যবস্থা হইলে তাহার অভাব এমন করিয়া দেশবাসী

বুঝিতে পারিত না। দেশের অধিকাংশ লোক বাধ্য হইয়া উপবাসে কাল কাটাইয়াছে; শতকরা দশভাগ খাদ্য কম থাকিলে অন্যান্য প্রদেশের সাহায্য সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথের কুকুর-বিড়ালের মত মরিতে দিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। আসল কথা, সরকারের অতিরিক্ত চাহিদায় ব্যবসায়ী মহলে ও ক্রেতাদের মধ্যে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। সরকারী অতি-ব্যস্ততার দরুণ আমরা প্রায় ধরিয়াই লইয়াছিলাম যে, দেশে এবার খাদ্য কম পড়িবে, সুতরাং শিল্পপতি এবং সচ্ছল পরিবারবর্গ যতদূর সম্ভব জিনিস ঘরে মজুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ব্যবসাদারেরা সুযোগ অপেক্ষা করিয়া রহিল কালা-বাজারের। পরে যখন সত্যসত্যই জিনিস দুষ্প্রাপ্য হইল, ব্যবসায়ীরা গোপনে গোপনে বাজারে যাহা ছাড়িতে লাগিলেন তাহা তেমনি দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় দেশবাসীর সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা বর্দ্ধিত মূল্যকে স্পর্শ করিতে না পারায় দরিদ্রের প্রথম সম্বল হইল ভিক্ষা এবং ভিক্ষা না জুটিলে শেষ সম্বল হইল শহরের ফুটপাথ ও অনাহারে মৃত্যু। ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে পণ্যাভাব ও পণ্যের অগ্নিমূল্যতার দরুণ বাংলাদেশে মন্বন্তর দেখা দিয়াছে। বাংলার এই দুর্ভিক্ষে দলে দলে লোক অন্নের অভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সরকারী অব্যবস্থা সমানে চলিয়াছিল বলিয়া অবস্থা কিছুতেই আয়ত্তে আনা যায় নাই। মালগাড়ী যুদ্ধের কাজে লাগিয়া বে-সরকারী পণ্য-জোগানের বেলায় সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গায় একটি বড় রেলপথ সাময়িকভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তাছাড়া বড় বড় মজুতদারের ঘরে ও সরকারী গুদামে যে খাদ্যবস্তুর পর্ব্বত পচিয়া গেল তাহার হিসাব দেওয়া অসম্ভব। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে বড় কর্ত্তব্য মানুষের আর নাই, কিন্তু হাতে ক্ষমতা

থাকিতেও এ দেশের কর্ত্তৃপক্ষ অসীম ঔদাসীন্যে বহু মানুষের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। মিঃ আমেরি বর্ত্তমান মন্বন্তরের কারণ হিসাবে পাঁচকোটি বাড়তি ভারতবাসীকে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই যুক্তি মানিয়া লইয়াও বলা চলে যে, এ দেশ শাসন করিবার গুরু-দায়িত্ব মাথায় লইয়া তাঁহার বা তাঁহার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই বাড়তি লোক-গুলির জীবনধারণের একটি মোটামুটি বাড়তি আয়োজন করিয়া দেওয়াও অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। আমাদের দেশে মাথাপিছু যে সওয়া চার মণ চাউল বা ঐরূপ কোন খাদ্য লাগে তাহা তো সরকারও স্বীকার করিয়াছেন। বার্ম্মা, সিঙ্গাপুর হাতছাড়া হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অধিবাসীদিগকে বাঁচাইবার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া ভারতের উদ্বৃত্ত প্রদেশগুলি হইতে বা ভারতের বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া এখানে জমাইয়া রাখা হইলে তাহা সুশাসনের পরিচায়ক হইত। খাদ্যসমস্যা যখন শুরু হয় তখন হইতেই সুধীবৃন্দ গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানান, গভর্ণমেণ্ট তখন কিন্তু কার্য্যকরী উপায়গুলি এড়াইয়া গিয়া সভাসমিতি ডাকিয়া নিজেদের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পণ্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে ভারত-সরকারের নামে ছয়টি পণ্য-সম্মেলন ডাকা হইল। ১৯৪২ সালের ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সম্মেলনে মালগাড়ীর অভাবজনিত অসুবিধার উপর জোর দেওয়া হয় এবং ১৯৪২ সালের ৭ই ও ৮ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলনে পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের সহিত খুচরা বিক্রয়ের দোকানগুলিতে যথেষ্ট মাল সরবরাহ করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কিছুতেই লক্ষণীয় কোন কাজ হইল না। গভর্ণমেণ্টের অস্থিরমতিত্ব সকল প্রদেশের জনসাধারণকে পরোক্ষে

স্বার্থপর হইতে উত্তেজিত করিয়াছে। বার বার নূতন নূতন মাল চলাচলের বিধিনিষেধ আরোপ ও প্রত্যাহার করিয়া সাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি ও ব্যবসাদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া বিশেষ লাভ হয় নাই। যখন বাংলায় চল্লিশ টাকা ও উড়িষ্যায় চৌদ্দ পনেরো টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে তখনও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট খাদ্য-ব্যবস্থায় প্রাচুর্য্য রক্ষা করিতে দুই কোটি টাকার চাউল কিনিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন! দেশরক্ষার নামে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি হইতে সমস্ত মাছের নৌকা কাড়িয়া লওয়ার ফলে প্রচুর মৎস্যভোজনে বা মৎস্য-বিক্রয়ে আংশিক অন্নসমস্যা-সমাধানের যে আশা ছিল তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের শত্রু-অগ্রগতিতে বাধাদানের এই বিচিত্র পরিকল্পনার (Denial policy) ফলে দেশবাসীই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই অথবা তাহাদের দুঃখের দিনে বাঁচিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভরসা নষ্ট হয় নাই, এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিয়া তুলিবার ব্যয় হিসাবেও গভর্ণমেণ্টের প্রায় সওয়া কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। জনসাধারণের টাকা খরচ করিবার অধিকার হাতে পাইয়া নিজেদের মানসিক দুর্বলতার জন্য সেই অর্থের এরূপ অপব্যয় রাজকর্মচারীদের সুনামের সহায়ক নয়। বাংলার আলোচ্য দুর্ভিক্ষ এমনিই ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল যে ইহাকে দ্বিতীয় ছিয়াত্তরের-মন্বন্তর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ক্ষুধার তাড়নায় প্রকাশ্যে ছেলেমেয়ে বিক্রয় আইনের ভয়ে ব্যাপক ভাবে সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু অভাবের তাড়নায় পরিজনের গলায় ছুরি বসাইয়া নিজে আত্মহত্যা করিবার মত করুণ ঘটনা বহু স্থানেই ঘটিয়া গিয়াছে! মায়ের রুগ্ণ অবস্থায় শিশুকে পথের মাঝে ফেলিয়া দিয়া অন্নসংগ্রহের চেষ্টায় জনতার মাঝে হারাইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে অত্যন্ত সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্য কয়েকটি শহরের অপেক্ষাকৃত

সচ্ছল অধিবাসীদের অবস্থা তবু মন্দের ভাল ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের ছিয়াশীহাজার গ্রাম অনশনে অর্দ্ধাশনে শ্মশান হইয়া গিয়াছে। বাংলার এই প্রচণ্ড খাদ্যাভাব সরকারী সহযোগিতায় প্রথম হইতে চেষ্টা করিলে অবশ্য দূর করা যাইত। সরকার শেষদিকে দুর্ভিক্ষ দূর করিতে কিছুটা সচেষ্ট হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিপদ আসন্ন দেখিয়াও তাঁহাদের টনক নড়ে নাই বলিয়াই অন্তিমকালের লক্ষণীয় প্রচেষ্টা তাঁহাদের ঐতিহাসিক কলঙ্ক স্খালনে কোন সাহায্য করিতে পারে নাই। কয়লা সরবরাহের জন্য ১৯৪১—৪২ সালের ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার মালগাড়ীর স্থলে ১৯৪২-৩৩ সালে মাত্র ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার মালগাড়ীর জোগান পাওয়া গিয়াছিল এবং খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য ১৯৪১-৪২ সালের ৭ লক্ষ ২২ হাজার মাল-গাড়ীর স্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে পাওয়া গিয়াছিল মাত্র ৫ লক্ষ ৮০ হাজার মালগাড়ী। এই অসুবিধা ছাড়াও প্রথম হইতে সরবরাহ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া সরকারী বিধিনিষেধের মধ্যে খাদ্য-নীতিকে টানিয়া আনার ফলে অনুন্নত মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা বিপুল উৎসাহে চোরাবাজারে ব্যবসা চালাইয়াছে। ১৯৪২ সালে যুদ্ধের গতি প্রতিকূল হওয়ায় সরকারী সাবধানতার আড়ম্বরে পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, সুন্দরবন ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে নৌকা ও যানবাহনাদি কাড়িয়া লওয়ার ফলে ঐ সকল ভূমিভাগ রিক্ত হইয়া গিয়াছিল। বার্ম্মা ব্রিটিশ হস্তচ্যুত হইবার পর হাঁটাপথে বা জাহাজে চড়িয়া বহুলোক ভারতে আশ্রয় লইয়াছে। এদিকে ইউরোপের যুদ্ধের অবস্থা যত অনুকূল হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানকে বিপর্য্যস্ত করার জন্য মিত্রপক্ষ হইতে বাংলায় সৈন্য আমদানী হইয়াছে ততই উৎসাহ সহকারে। ৬ কোটি ১৪ লক্ষ স্থায়ী বাসিন্দা ও সমাগত অতিথিবৃন্দকে লইয়া বাংলার

লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি, এই বিপুল জনমণ্ডলীকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা যুদ্ধ-লইয়া-ব্যস্ত সরকার সুষ্ঠুভাবে করিতে পারেন নাই। বার্ম্মা-প্রত্যাগতেরা বাংলাদেশে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি গভর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং জনসাধারণকে ভরসা দিতে পারিতেন, তাহা হইলেও বাংলাদেশের অবস্থা এতটা শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারিত না। তাছাড়া ছয় মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু উপেক্ষা করিয়াও যে মজুতশালায় খাবার জমিয়াছিল, বাজার নরম হইয়া আসিবার পর বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া শস্য দেখিয়াও তাহা অনুভব করা অসম্ভব হয় নাই। যে চাউল বাজারে ছাড়া হইয়াছিল, তাহার কিছু অংশ খারাপ হইয়া গেলেও তাহাতে আমন চালও ঢের ছিল এবং সেগুলি অবশ্যই ১৯৪২ সালের উৎপাদন। তাছাড়া শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের মজুত করা যে খাদ্যশস্য অখাদ্য হইয়া যাইবার অজুহাতে হাওড়া বেলগেছিয়া ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেবলমাত্র তাহাই ২০০ লরি ভর্ত্তি মাল। এরূপ আরও কত খাদ্যশস্য যে সরকারী তত্ত্বাবধানের ফাঁকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া আমাদের কর্ম্ম নয়। এই জমান চাউল প্রভৃতি খাদ্য যদি সময়ে বাহির করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলেও নিঃসন্দেহ বহু জীবন রক্ষা হইতে পারিত। ইহা ব্যতীত সরকারের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের মন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিং যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাও সহানুভূতিসম্পন্ন যে কোন লোককে ব্যথাতুর করিয়া তুলিবে। পাঞ্জাবের গম কিনিয়া বাংলায় বিক্রয় করার ভিতর যে শতকরা পাঁচটাকা লাভের ব্যবস্থা ছিল তাহা দরিদ্রের পক্ষে মারণাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। যদিও সরকার পক্ষ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে লাভের টাকা অন্যদিক হইতে আর্ত্তত্রাণে নিয়োজিত করা হইয়াছে, তথাপি বার টাকা মণ দরে যাহারা

আটা কিনিতে পারিত, তাহারা সতেরো টাকা দিতে নাও পারিতে পারে,—এই সহজ কথাটা কি করিয়া যে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল তাহাই আশ্চর্য্য। দরিদ্র শ্রমসহিষ্ণু জনসাধারণের ক্রয়শক্তির বাহিরে ইচ্ছা করিয়া অন্নমূল্য টানিয়া লইয়া যাওয়ার ফলে নিত্যব্যহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্যের দামই যে আপেক্ষিকভাবে বর্দ্ধিত থাকিয়া যাইবে ইহা তো সাধারণ বুদ্ধির কথা। যাহাদের অনেক আছে তাহারা সতেরো কেন সাতাশ টাকায়ও আটা কিনিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সুবিধা অসুবিধা বড করিয়া দেখিয়া দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় দরিদ্র শ্রেণীকে যে জোর করিয়া মরণের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইল, ইহা সত্যই খুব দুঃখের বিষয়।

আমাদের দেশে কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৬·৬ ভাগ পাওয়া যায় এবং সমগ্র দেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ অধিবাসী কৃষক। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে অনভিজ্ঞ চাষীরা সাময়িক চড়া বাজারের দুর্লভ সুযোগ লইতে গিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সেই সময় কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাহাদের বাঁচাইবার ব্যবস্থা করা। ক্রমে যখন পণ্যাদির বাজার দর না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, গ্রামের অবস্থা তখন হইয়া উঠিল শোচনীয়। যুদ্ধের কাজে মালগাড়ীর প্রয়োজন, কাজেই বেসরকারী সরবরাহে আশানুরূপ মালগাড়ী পাওয়া গেল না। কর্ত্তৃপক্ষের খেয়াল হইবার পরও ভাগ্যদোষে দামোদরের বন্যায় ই-আই-আর লাইন বন্ধ হওয়ায় অধিকাংশ স্থলে একটি লাইনযুক্ত বি-এন-আরের পক্ষে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী মাল বাংলা দেশে পৌছাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইল। সময়মত খাদ্য না পাওয়ায় না খাইয়া এবং কুখাদ্য খাইয়া বাংলার এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়া-

ছিল। এই সংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ বহু অনুসন্ধানের পর ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও মিঃ আমেরি এই দুর্ভিক্ষে মোট মৃত্যু সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা অবশ্যই ঘটনার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচিত সাপেক্ষ ভাবে বলেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত এই সংখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বাংলা সরকারের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী পর্য্যন্ত পরিষদে বলিয়াছেন যে, বাংলায় দুর্ভিক্ষে মৃতের যে সংখ্যা মিঃ আমেরি দিয়াছেন উহা অবশ্যই কোন একটি বিশেষ সময়ের সংখ্যা। উপবাসে মরার হিসাব ভিন্নভাবে রাখা হয় না, তাই কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সরকারী ভাবে কিছুতেই সম্ভব নহে।

মোট কথা ১৯৪৩ সালে যাহারা দেশের শাসনযন্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা, স্বৈরাচার ও অকর্ম্মণ্যতাই সর্ব্বনাশের মূল কারণ। বাংলার মন্ত্রী-মণ্ডলীকে অবশ্য সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না, দোষ তাঁহাদের আছে এবং তাঁহারা অযোগ্য হইতে পারেন কিন্তু তাঁহারা যে অসহায় সেকথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ঢাকার দাঙ্গা, মেদিনীপুরের বিপর্য্যয়, ফজলুল হক সাহেবের পদত্যাগ প্রভৃতি ব্যাপারে বাংলার গভর্ণর স্যার জন হার্ব্বাটের দুর্নামই রটিয়াছিল। তিনি বাংলাকে শাসন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পালন করাও যে তাঁহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ভাল কাজ তিনি করিয়াছেন, বাংলাদেশের গদীতে বসিয়া বহু প্রতিষ্ঠানের সত্যকার হিতকল্পে চেষ্টাও তিনি করিয়াছেন ঢের, কিন্তু যাহা তাঁহার নিকট হইতে কেহই আশা করেন নাই, এমনিভাবে তিনি উল্লিখিত কয়েকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া জনসাধারণকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমাদের এই বাংলাদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে বহু চাউল আমদানী হইত একথা সত্য। অনেকের মতে ইহা আমাদের প্রয়োজনের দশ-মাংশ। এই হিসাব অপেক্ষা সত্যকার আমদানী যদি কিছু বেশীই হয় তাহা হইলেও বাকী চাউল যথাযথভাবে বণ্টন করিলে দেশে এমন ভয়াবহ মন্বন্তর অবশ্যই দেখা দিত না। উৎসবে, অনুষ্ঠানে বা সাধারণ ব্যবহারে দেশে বস্তুসঙ্কোচের যথেষ্ট চেষ্টা ছিল; বার্ম্মা হইতে চাউল না আসা এবং মেদিনীপুরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ছাড়া ১৯৪৩ সালে বিরাট বাংলাদেশে আর কোথাও অজন্মা প্রভৃতির সংবাদ আমরা জানি না। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে উপযুক্ত পরিচালনা থাকিলে এই বস্তুর স্বল্পতা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ কিছুতেই এদেশে সম্ভব হইত না। মজুতশালা হইতে বহু চাউল ও আটা নষ্ট হইয়াছে আনাড়ী লোকের হাতে পড়িয়া। বড় বড় বণিকেরা বহু মাল আটক করিয়া নষ্ট হইবার সুযোগ দিয়াছেন। সৈন্য ও সামরিক বিভাগে সচ্ছলতা বজায় রাখিতেও বেসরকারী অধিবাসীদিগকে কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইয়াছে। ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার আজিজুল হক, খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মেজর জেনারেল উড ও বাংলার বেসামরিক খাদ্যসচিব সুরাবর্দ্দি সাহেব বাংলার খাদ্য ১৯৪৩ সালে কম পড়িবে না বলিয়া মিথ্যা আশ্বাস দেওয়াতেও আমাদের অন্ধকার যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। অবশেষে যখন ইঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন, তখনও পর্য্যন্ত ভারত-সরকার ইঁহাদের পক্ষে সাফাই গাওয়া বন্ধ করিলেন না। মজুত বন্ধ করিবার, অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিবার এবং বারবার মাল চলাচলের বিধিনিষেধ আরোপ ও প্রত্যাহার করিবার ছেলেখেলাই কি মন্ত্রিমণ্ডলীর কৃতিত্বের পরিচয়? কলিকাতার খোলাবাজারে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে হাজার হাজার দোকানে এককণা চাউল পাওয়া যায় নাই, কন-

ট্রোলের ভিড়ে মারামারি করা ছাড়া খাদ্যসংগ্রহ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু কলিকাতায় প্রত্যহ কমপক্ষে একশতজন নিঃস্ব ব্যক্তি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সব চেয়ে লজ্জার কথা এই যে, সরকারী চেষ্টা চলিয়াছিল যাহাতে বাংলার অবস্থা লঘু করিয়া দেখান যায় বা একেবারে চাপিয়া যাওয়া যায়। সত্য প্রকাশে বাধা দেওয়ার এই অপচেষ্টার ভিতর উগ্র সরকারী স্বার্থ ছিল। দুর্ভিক্ষ যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে তখন পর্য্যন্ত ভারতসচিব বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং নানা চাপে পড়িয়া মাত্র ১৯৪৩ সালের ১৫ই অক্টোবর অতি লঘুভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন যে বাংলায় অন্নকষ্ট হইয়াছে এবং সপ্তাহে হাজার খানেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কিন্তু ১৬ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল তাহাতে এক কলিকাতাতেই ২১৫৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার ৫৭৩ জনকে বাদ দিলে এই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৫৮১ জন অনাহারে মরিয়াছে বলা চলে। বাস্তবিক অহেতুক বিস্ময়কর মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যাভাব ও রেলওয়ে অব্যবস্থা এবং সব চেয়ে বড় করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখবর্ত্তী পরম প্রয়োজনীয় ভূমিভাগে দুর্ভিক্ষ,—এই কলঙ্কগুলি কর্ত্তৃপক্ষের ১৯৪৩ সালের ভারতশাসন কালকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। লর্ড লিনলিথগো প্রায় সাড়ে সাত বৎসর ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, এই ঐতিহাসিক বড়লাটের শাসনকালেই ভারতের চরম দুর্দ্দিন আসিয়াছে। আর্থিক অনটনে, মানসিক অশান্তিতে ও আত্মসম্মানহীনতার দৈন্যে ভারতবাসী ইঁহার শাসনকালেই সবচেয়ে অধিক পরিমাণে ক্লিষ্ট হইয়াছিল, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ দুঃখের পানে ইনি চাহেন নাই এবং সম্ভবত সত্যকার পরিস্থিতির লঘু বর্ণনা স্বদেশে পাঠাইয়া ইনি বিশ্বের সহানুভূতিলাভ হইতে আমাদিগকে ইচ্ছা করিয়া

বঞ্চিত রাখিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা না গেলেও যুদ্ধের পটভূমিকে যোগ্য মর্য্যাদা দিতে অস্বীকার করা তাঁহার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। শিল্পসংগঠনে বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া ইনি ভারতের বাণিজ্যবিস্তৃতির সুবর্ণসুযোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন; বোনাস দিবার সম্বন্ধে আইনের কড়াকড়ি করিয়া হয়তো ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়ে উৎসাহ বা দুঃস্থ কর্ম্মচারীদের অন্নসমস্যা সমাধানের চেষ্টা,—এই দুই মহৎ প্রয়াস হইতে ইহার জন্যই দেশবাসী নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। আসল কথা লর্ড লিনলিথগো এবং স্যার জন হার্ব্বার্ট যদি লর্ড নর্থব্রুক এবং স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন তাহা হইলে সরকারী দূরদৃষ্টিতেই বাংলার দুর্ভিক্ষ-রোধ সম্ভব হইত। তাঁহাদের দুইজনের অন্যান্য বহু যোগ্যতা স্বীকৃত হইলেও আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে তাঁহাদের কার্য্যাবলীর দ্বারা তাঁহারা সারা দেশব্যাপী নিঃসীম হতাশার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে এখন সম্মিলিত পক্ষের জয়লাভের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, সুতরাং জাপানকে আক্রমণ করিয়া বার্ম্মা সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করিবার যে বিরাট আয়োজন চলিতেছে, তাহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। এখন আমাদের এই বাংলাদেশই যুদ্ধের পটভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইবে। আমাদের দেশেই ৬ কোটির বেশী লোকের বাস। ইহার উপর বার্ম্মা হইতে যাহারা আসিয়াছে এবং যুদ্ধের জন্য যে বিদেশীর দল এখানে রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা শুধু বিপুল নয়, অতিথি হিসাবে তাহাদের সৎকার করাও এই দুর্দ্দিনে বাংলার পক্ষে মারাত্মক ব্যাপার। মন্বন্তরের সময় অসংখ্য দুঃখের ভিতর দিয়া আমাদের অল্প কয়জন কায়ক্লেশে বাঁচিয়া আছে,

আসন্ন অস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনায় আমরা সত্যই ভয়াতুর এবং বরাতে যদি যুদ্ধের পটভূমিকার অধিবাসিত্বের মাশুল দেওয়া থাকে, তাহা হইলে দুর্ব্বল আমাদের পক্ষে নিছক জীবনধারণই হয়তো সম্ভব হইবে না। গত বৎসর যে ঝড় বহিয়া গেল, তাহার ক্ষতির জের দু এক বৎসর অবশ্যই চলিবে এবং দুর্ভিক্ষ যদি আর নাও হয়, ব্যাতাবিক্ষুব্ধ জীবনের জীর্ণ বনিয়াদ সব দিক হইতে সংস্কার না করিলে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না। বাস্তবিক ভাঙ্গা শরীরে যদি বাংলার অধিবাসীকে দীর্ঘদিন বর্ত্তমানের মত অভাব সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে যে ভাগ্যবানের দল অতি কষ্টে তেরশো-পঞ্চাশী মন্বন্তরকে ফাঁকি দিয়া আসিল, দুর্ভিক্ষের জের সামলাইতে অক্ষম হইয়া ঘাটের কাছে ভরাডুবির কলঙ্ক হইতে তাহারা কিছুতেই মুক্তি পাইবে না।

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভাল ফসল হইয়াছে,—বাংলার গভর্ণর হইতে শুরু করিয়া অনেকেই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালে বাংলার ভয় নাই। আশ্বাস অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ দুর্ভিক্ষের আগেও দিয়াছিলেন কিন্তু সে আশ্বাসের ফল কি হইয়াছিল তাহা আজ ভাবিতেও ভয় হয়। তাহার উপর এবারও সরকারের দিক হইতে এখনই গাওয়া শুরু হইয়াছে যে, বাংলার পল্লী অঞ্চলে ধানসংগ্রহ কৃষকদের সহানুভূতির অভাবে আশানুরূপ হইতেছে না। কলিকাতায় দুঃস্থ বিতাড়নের পর যে আর্ত্ত হাহাকার গত কয়েক মাস বন্ধ ছিল তাহার ক্ষীণ পুনরাবৃত্তি আবার শোনা যাইতেছে। যদিও আমরা কর্ত্তৃপক্ষের মতি পরিবর্ত্তনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একান্ত আশা করি যে দুমুঠো ভাতের জন্য এবৎসর আর মৃত্যুশোভাযাত্রা দেখিতে হইবে না, তবু আবহাওয়ায় যেন দুর্য্যোগের আভাস পাওয়া যাইতেছে। শস্য যতই হউক, বহিরাগত জনমণ্ডলীর সহিত সমস্ত বাংলা

দেশের পক্ষে তাহা কিছুতেই পর্য্যাপ্ত নহে। তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে,দুই বৎসর যাবৎ নিজেদের পুঁজি ভাঙ্গাইয়া অতি কষ্টে যাহারা মরণকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অপচয়ের কথা দূরে থাক, স্বাভাবিক বাজারেও (যাহার আগমন সম্বন্ধে এখনও ভবিষ্যদ্-বাণী করিবার দিন আসে নাই) প্রয়োজনের সম্পূর্ণ পরিমাণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইবে। ইহার ফলে অনেকের পক্ষে জীবন ক্লান্তিকর হইয়া উঠিলেও ব্যয়সঙ্কোচের দরুণ ফসলের ঘাটতিটুকু পূরণ হওয়া অসম্ভব হইবে না। যদি পৃথিবীর যে কোন স্থানে ফ্রণ্ট খুলিবার আংশিক খাদ্যদায়িত্ব সরকার বাংলার ঘাড়ে না চাপান এবং ব্রহ্ম অভিযান বা ভারতরক্ষার নামে যে সাদা কালা অসংখ্য সৈন্য বাহির হইতে আমদানী করিয়াছেন তাহাদের খাদ্যও যদি ঠিক সেইভাবে বাহির হইতে আনিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে হয়তো আমাদের দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে। বন্দীনিবাসের খাদ্য-সরবরাহের দায়িত্ব হইতে এই দারুণ দুঃসময়ে বাংলাদেশকে মুক্তি দেওয়া অবশ্যই উচিত। যদি এই সকল প্রয়োজনের অজুহাত না থাকে তাহা হইলে সরকার পক্ষ হইতে খাদ্য আবদ্ধ রাখিয়া অপচয় করিবার ব্যবস্থা করার কোন অর্থ হয় না। গভর্ণমেণ্ট বাংলাদেশে রেশনিং প্রথা আংশিকভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সম্পূর্ণভাবে এই প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার দায়িত্ব যদি তাঁহারা লইতে পারেন, তাহা হইলেও আসন্ন অন্নাভাব হইতে বাংলার রক্ষা পাওয়ার কিছুটা আশা থাকে। তবে রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের বোঝা উচিত যে, মানুষ তাঁহাদের বরাদ্দ খাবারের উপর নির্ভর করিলেও খারাপ খাবার বা নোংরা খাবার খাইয়া তাহার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়; কাজেই খারাপ খাবার বা কাঁকর প্রভৃতি মিশানো চাউল

এবং নোংরা আটা ইত্যাদি বাজারে যতদুর সম্ভব কম যাহাতে আসে সেজন্য গভর্ণমেণ্টের তীক্ষ্নদৃষ্টির প্রয়োজন। যাহারা সরবরাহের ভার পাইয়া খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইতেছে তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিলেও জনস্বাস্থ্য অনেকটা রক্ষিত হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট যদি সারা বৎসর সমগ্র দেশে ভাল খাবার জোগাইবার দায়িত্ব লন এবং দেশবাসীর বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারেন তাহা হইলে বণিক ও অর্থশালী ব্যক্তিগণ বাজারে আমদানীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া ভবিষ্যতে একদিন মাল পাওয়া যাইবে না বলিয়া অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত হইবেন না এবং তাঁহারা মজুত করিবার মনোবৃত্তি পোষণ না করিলে জোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া আমাদের ক্রয়-শক্তির মধ্যেই পণ্যমূল্য নামিয়া আসিবার আশা থাকিবে। চাউল, আটা চিনি প্রভৃতি অল্প কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বর্ত্তমানে রেশন-প্রথাভুক্ত হইয়াছে। সরকারের উচিত আরও অনেক বেশীসংখ্যক আবশ্যকীয় পণ্য বরাদ্দ-নীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া সারাদেশে রেশনিং প্রথা চালু করা। যুদ্ধের পরেও তিন চারি বৎসর রেশন-ব্যবস্থা চলিবে বলিয়া শোনা যাইতেছে, এরূপ কোন দীর্ঘস্থায়ী নীতি অবলম্বন করার আগে নীতির সার্থকতা এবং দেশের স্বার্থ ভাল করিয়া সরকারের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। গতবারের দুর্ভিক্ষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে সাচ্ছল্যসৃষ্টির যদি সামান্য-সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইতে দেশবাসীকে বঞ্চিত করা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত হইবে। বেসরকারী কাজে মালগাড়ীর জোগান কিছু পরিমাণে বাড়াইয়া সরকারের উচিত—যখনই পাওয়া যাইবে—অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে উদ্বৃত্ত খাদ্যাদি বাংলায় আমদানী করিয়া মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা। জাপানের সহিত যুদ্ধে যদি

নামিতেই হয় এবং বার্ম্মা প্রভৃতি দেশ পুনরুদ্ধার করিবার যদি ইচ্ছা থাকে, বাংলার তথা ভারতের অধিবাসীদের সম্প্রীতি, সাহায্য এবং সহানুভূতি হারানো রাজনীতিজ্ঞের কাজ হইবে না। বাংলাকে বাঁচিতে দিলে অথবা বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে বাঙ্গালী সত্যই কৃতার্থ হইয়া যাইবে। মৃত্যুর গ্রন্থি হইতে জীবনকে ছিনাইয়া আনা যদি সম্ভব হয় জীবনদাতাকে দেশবাসী সহজে ভুলিয়া যাইবে না। এই কারণেই তাঁহার অল্পকাল স্থিতির মধ্যে সামান্য উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া স্যার রাদারফোর্ড জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। লর্ড ওয়াভেল বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যেটুকু আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই কার্য্যভার-গ্রহণের প্রথম দিকে তিনি জনসাধারণের আশার বস্তু হইয়া উঠেন। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা বিদেশী স্বার্থের পোষণ করেন, জাতীয়তাবাদী প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া সাধারণত এই পত্রিকার মতবাদ তেমন সমাদৃত হয় না,তবু বাংলার দুর্ভিক্ষ লইয়া এই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাখানি যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাংলার মানুষের সৃষ্ট বিপর্য্যয়ের ইতিহাস যেভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর বুভুক্ষার বার্ত্তা দেশে বিদেশে প্রেরণ করিয়া বিশ্বের সহানুভূতি লাভে বাংলাকে যেভাবে তাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার জন্য বাঙ্গালী স্টেটস্‌ম্যানের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছে। অন্য সকল কথার উর্দ্ধে আজ আমাদের জীবনে স্থান পাইয়াছে অন্নসমস্যার কথা। যুদ্ধের পরে ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন পৃথিবী গঠনের বিরাট পরিকল্পনা হইতেছে, যুদ্ধোত্তর-পুনর্গঠনের জন্য অনেক মনীষীই মাথা ঘামাইতেছেন,কিন্তু ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে অসহায় নিরপরাধ বাংলার যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার ভার লইবে কে? ইহার পর যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, নিঃসম্বল সেই

সব নরনারীকে ঘর বাঁধিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা শুধু ব্যয়সাপেক্ষ নহে, ইহার জন্য অগাধ সহানুভূতি ও বেদনাবোধেরও প্রয়োজন। চিরকাল জাতির দুঃখঝঞ্ঝা যাঁহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, যাঁহারা বন্যা, মহামারী ও অসংখ্য ছোটবড় বিপদের দিনে দেশবাসীকে বাঁচাইবার সংকল্পে নিজেদের নিঃস্ব ও রিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই দেশহিতৈষীদের মন্বন্তরের সময় কারারুদ্ধ করিয়া রাখায় ভারত-সরকার এদেশের দুর্দ্দশায় চরম ঔদাসীন্য ও নিষ্ঠুর মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বোম্বাইয়ের অগ্নিকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবকত্ব গ্রহণের জন্য ইটালীয় বন্দীর দল যদি সাময়িকভাবে মুক্তি পাইতে পারে এবং সেকথা সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া সরকার যদি আপনাদের উন্নত হৃদয়ের পরিচয়-স্বীকৃতির দাবী করিতে পারেন, বাংলার সর্ব্বনাশী দুর্ভিক্ষের দিনে দেশের শ্রেষ্ঠ জনহিতৈষী কর্ম্মীদের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাখিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। ইহাদের মুক্তি দিলে, অন্তত সাময়িকভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীর প্রাণরক্ষার জন্য বাহিরে আসিতে দিলে, ইঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিচালনা, সংগঠনশক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার চেহারা ফিরিয়া যাইতে পারিত। যাহারা মরিবার মরিয়াছে, কিন্তু যাহারা আজও মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়া জীবনের অসীম মায়ায় ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিতেছে, তাহাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা করার চেয়ে অধিকতর মানবতাবোধের পরিচয় পৃথিবীতে আর নাই। ভারতসরকার বর্ত্তমানে বৃহত্তর কলিকাতার অন্ন সরবরাহের ভার লইয়াছেন, বাংলা সরকার রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাছাড়া গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করিয়া দুর্ভিক্ষ-স্রষ্টাদের অনুসন্ধান ও দুর্ভিক্ষ-সম্ভাবনা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাংলার বেসামরিক অধিবাসীদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে একটু

অবহিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। জাতির একাংশের মৃত্যু-মূল্যে আমরা আমাদের শাসকবর্গের নিকট হইতে এই মতিপরিবর্ত্তন-টুকু কিনিতে সক্ষম হইয়াছি। কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার অর্থ-সঙ্কট দূর করা বা গাছ পুঁতিয়া ফলভোগ করিবার যুক্তির অবশ্যই দাম আছে এবং যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সুযোগে দেশে শিল্পপ্রচারের দ্বারা জন-সাধারণের একাংশের অন্নসমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা খুবই উচিত। কিন্তু এখন উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে অপেক্ষা করা তো চলিবে না। বেসামরিক অধিবাসী হিসাবে আমরা আমদানী করা বা এদেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটা ন্যায্য ভাগ পাইবার বাসনা করি। যুদ্ধের জন্য দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের সকল সম্ভাবনা দূর করিতে যুদ্ধজয়ের চেষ্টার মতই খরচ করা উচিত। মানুষের মনের বল রক্ষা না করিলে মানুষ অন্যায় করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে, অথচ সেইরূপ জীবন হয়তো সেই দুষ্কৃতকারীও চাহে না। ইংলণ্ডের খাদ্যসচিবের দপ্তরের স্থায়ী সেক্রেটারী স্যার হেনরী ফ্রেঞ্চ দিল্লীর এক সাংবাদিক সভায় ভারতের বেসামরিক জনগণের প্রতি সরকারী উদাসীনতার সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দু'তিন বৎসর পূর্ব্বে হইতে সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য জোগাইবার ব্যবস্থা হয় এবং সেদেশে বেসামরিক দেশবাসীকে মনে করা হয় "Forces on the front line"। খাদ্যসচিবের এই দূরদর্শিতার জন্যই ইংলণ্ডে একজন লোকও অনশনে মরিতে বাধ্য হয় নাই। আগে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের উচিত এখনও এদেশবাসীর মুখের পানে চাওয়া। বাংলার অধিবাসীদের স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হইবার চরম মুহূর্ত্ত আজ সত্যই আসিয়াছে।

জাপানীদের দ্বারা যদি কোন বিপর্য্যয় না ঘটে তাহা হইলে সরকারী

সাহায্যে আমরা, যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছি, চেষ্টা করিলে আমাদের দেশকে আবার নূতন রূপ দিতে পারিব। মনের ক্লৈব্য ও জড়তা এবং অভাবের অনুশোচনা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে শুধু ঘরছাড়াই করে নাই, সমাজ, কৃষ্টি ও জাতীয়তাবোধও ভুলাইয়া দিয়াছে। মৃত্যু ছাড়াও অনিবার্য্য সামাজিক বিপ্লবের যে বন্যা আসিয়াছে তাহার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া দক্ষহস্তে হাল না ধরিলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী বলিয়া আর পরিচয় দেওয়া চলিবে না। একে অভাবে জমি বিক্রয় করিয়া কৃষক-শ্রেণী ভবিষ্যতের পথ অর্দ্ধেক নিজের হাতে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপর বাঁচিবার নিশ্চিত রাস্তা যদি কেহ দেখাইয়া না দেয়, মৃত্যু ও জীবনের নিষ্ফল সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় বাংলার পল্লীগ্রামের শ্মশানত্বই তাহারা সৃষ্টি করিবে। গ্রামে গাঁথা বাংলাদেশকে বর্ত্তমান দুর্য্যোগ হইতে বাঁচাইতে হইলে গ্রামবাসীর হাতের কাছে তাহাদের হারাইয়া যাওয়া জীবনের সহজ সুন্দর দিকটি ফিরাইয়া না দিলে চলিবে না। সরকারী আর্থিক সাহায্য, আইন ও সমগ্রজাতির কার্য্যকারী সহযোগিতা ছাড়া সে ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	লাইন	স্থানে			হইবে
১০	৯	বিবিধ	,,	ববিন	,,
১৮	৭	২৩১৪	,,	২৩১'৪	,,
২৪	৬	৭ পাউণ্ড	,,	৮ পাউণ্ড	,,
২৪	১৪	৬০০ কোটি	,,	৩০০ কোটি	,,
২৯	১০	Land-lease	,,	Lend-lease	,,
৩৩	২২	(১০'২) ভাগে	,,	১০'২ ভাগ	,,
৩৩	২৩	বলিয়া মাথাপিছু	,,	বলিয়া দেশবাসীর মাথাপিছু	,,
৩৩	২৪	শিল্প-শ্রমিকদের	,,	শিল্প হইতে	,,